শারীরবৃত্ত
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৮ ॥

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯১. ওড়িয়া সাহিত্য

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯২. অসমীয়া সাহিত্য

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন
৯৩. জৈনধর্ম

ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৯৪. ভাইটামিন

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
৯৫. মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
৯৬. বাংলার পালপার্বণ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণমনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০-১৩৫৮ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৯৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

শারীরবৃত্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় এই পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া সযত্নে দেখে দিয়েছেন এবং পরিভাষা রচনাতে আমাকে অক্লান্তভাবে সাহায্য করেছেন; এজন্য তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রকাশ ১ পৌষ ১৩৫০

পুনর্মুদ্রণ ১ ফাল্গুন ১৩৫১, পৌষ ১৩৫৯

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা।

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

+২.১+২.১

দেহের গঠন

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অত্যাবশ্যক নানা ব্যবস্থাযুক্ত সম্পূর্ণ আধুনিক বাসগৃহের পরিকল্পনার সঙ্গে প্রাণিদেহের গঠনের সাদৃশ্য দেখে অবাক হতে হয়। অস্থি, দাঁত, নখ প্রভৃতির যেন দেহের কড়ি-বরগা, রেলিং-চৌকাঠ; পেশী উহার ইট-পাথর; চামড়া চুনকাম করা বহিরাবরণ; রক্ত-প্রণালীগুলি জলের নল এবং হৃৎপিণ্ড উহার পাম্প; ফুসফুস ও শ্বাসপ্রণালীসমূহ বায়ুচলাচলের যন্ত্র; পাকস্থলী ও অন্ত্রগুলি রান্নাঘর; যকৃৎ তৎসংলগ্ন ভাঁড়ার; মূত্রাশয়, উহার প্রণালী ও মলাশয়, ড্রেন-পায়খানা; মস্তিষ্ক টেলিফোন-নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র এবং স্নায়ুগুলি উহার বৈদ্যুতিক তার; চোখ ছবি-তোলবার ক্যামেরা এবং কান শব্দগ্রহণের যন্ত্র। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মানুষের গড়া এইরূপ গৃহকে কিছুতেই ভগবানের গড়া প্রাণিদেহের সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে না; কেননা প্রাণিদেহের স্বতোবৃদ্ধি, সচলতা, উত্তেজনাপ্রবণতা, প্রজননক্ষমতা প্রভৃতি জীবনীশক্তির পরিচায়ক বিশিষ্ট গুণগুলি গৃহের ন্যায় কোনও জড়বস্তুতে থাকা সম্ভবপর নয়।

(ক) অস্থি ও দন্ত—ছোট, বড়, লম্বা ও চ্যাপটা ২০৬টি হাড়ের দ্বারা মানুষের দেহটি গড়া। হাত-পায়ের প্রধান হাড়গুলি সাধারণত লম্বা ফাঁপা নলের মত এবং তাদের উভয়প্রান্ত দেখতে অনেকটা মৌচাকের ন্যায়। ফাঁপা অংশের মধ্যে হলদে রঙের মজ্জা আছে এবং প্রান্তগুলিতে যে লাল মজ্জা থাকে, তাতেই রক্ত জন্মায়। মাথার খুলি এবং পাঁজরার হাড়গুলি আকারে চ্যাপটা, এবং এদের মধ্যেও লাল মজ্জা থাকে বলে রক্ত উৎপন্ন হয়।

লম্বা হাড়গুলি একপ্রকার কোমল-অস্থি হতে, এবং চ্যাপটা হাড়গুলি একপ্রকার আবরণ হতে গ'ড়ে ওঠে। ভ্রূণদেহে, উহাদের মধ্যে ক্রমশ অস্থিকোষগুলি দেখা দিতে থাকে এবং পরে ক্যালসিয়ম জমা হয় ব'লে শক্ত হাড়ে পরিণত হয়। শিশুকালে লম্বা হাড়গুলির প্রান্ত দুটি স্বতন্ত্র থাকে, এজন্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ বেড়ে উঠতে পারে। কৈশোরের পরই ঐগুলি পিটুইটারি, যৌনগ্রন্থি প্রভৃতির প্রভাবে মধ্য অংশের সঙ্গে জুড়ে যায় ব'লে দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। হাড়ের মধ্যে জৈব (organic) এবং অনঙ্গারক (inorganic) উপাদানের অনুপাতের উপর দৃঢ়তা, শক্তি ও অনমনীয়তা নির্ভর করে, তার ব্যতিক্রম হলে রিকেট্স প্রভৃতি রোগ জন্মে। প্যারাথাইরয়েড (উপগলগ্রন্থি)-এর অন্তঃক্ষরণ, সূর্যালোক এবং ভাইটামিন 'ডি'র প্রভাবে এই অনুপাত ঠিক থাকে ; এজন্য হাড়ের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য এইগুলি অত্যাবশ্যক।

দন্ত

জন্মের কিছুকাল পরেই যে দাঁত ওঠে, পরে তা আর থাকে না ; ঐ সকল স্থানে শৈশবে এবং পরে নূতন দাঁত দেখা দেয়।

দাঁতগুলি মুখের মধ্যে দুই সারিতে সংখ্যায় বত্রিশটি। এদের কতকগুলি খাদ্যকে কেটে টুকরো টুকরো করে, কতকগুলি ধারালো কুকুরের দাঁতের ন্যায়, আবার কতকগুলি খাদ্যকে জাঁতার মতো পিষে ফেলবার চেষ্টা করে, এজন্য এদের যথাক্রমে কৃন্তক দন্ত (incisor), ছেদক দন্ত (canine) এবং পেষক দন্ত (molar) বলা হয়। দুই সারির সকলের পশ্চাতের চারিটি দাঁত যৌবনকালে দেখা দেয় বলে এদের আক্কেল-দাঁত বলা হয়।

অস্থির ন্যায় দাঁতের স্বাভাবিক গঠন রক্ষার জন্যও খাদ্যে ক্যালসিয়ম

ফসফেট প্রভৃতি লবণ, এবং ভাইটামিন 'ডি' উপযুক্ত পরিমাণে না থাকলে চলে না।

(খ) পেশী—চামড়া ও তার ঠিক নীচেই চর্বির হলদে রঙের আবরণটি সরিয়ে নিলে প্রত্যেকটি হাড়ের সহিত সংযুক্ত অনেকগুলি মাংসপেশী (muscle) দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত এই পেশীগুলি এবং তার বাহিরে যে চর্বির আবরণ থাকে, তার জন্যই শরীরকে কোমল ও সুগঠিত দেখায়। আমাদের দেহে এরূপ পেশীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যভাগ পুষ্ট এবং সরু ও পাতলা প্রান্তভাগ হাড়ের সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে ; এইজন্যই এদের সাহায্যে দেহের যে-কোনো অংশকে ইচ্ছামত চালনা করা যায়। ইচ্ছাধীন এরূপ পেশীকে ঐচ্ছিক পেশী (voluntary muscle) কহে। উপযুক্ত ক্রিয়া ও পরিমিত চালনায় এই পেশীগুলি পুষ্ট ও বর্ধিত হয়।

আবার পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশয়, জরায়ু প্রভৃতির যে পেশীগুলি আমাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও নিজেদের কাজ ক'রে যায়, তাদের নাম অনৈচ্ছিক পেশী (involuntary muscle)। কার্য হিসাবে হৃৎপিণ্ডের পেশী এই শ্রেণীর হলেও, গঠন হিসাবে উহা ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক দুই প্রকারের পেশী হতেই বিভিন্ন।

প্রত্যেক পেশীই স্বাভাবিক অবস্থায় কিছু-না-কিছু সংকুচিতভাবে থাকে ; ফলে, এরা পরবর্তী ক্রিয়ার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকে, তাদের আবশ্যকমত পুষ্টিলাভ ও স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষা হয়, এবং নানা বাধা-বিপত্তি, অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং রোগ-সংক্রমণের প্রতিষেধের শক্তি জন্মে।

উত্তেজনাপ্রবণতা পেশীর একটি স্বাভাবিক ধর্ম; বহিরাগত যে কোনও উত্তেজনার ফলে পেশী সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। এইভাবে

প্রত্যেক সংকোচনের পর অল্পক্ষণের জন্য পেশী শিথিল হয়ে পড়ে, এবং পরে পুনরায় তার সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ফিরে আসে। অনেকক্ষণ ক্রমাগত কাজের পর পেশীর উত্তেজনাপ্রবণতা ক্রমশ লোপ হতে থাকে ; খুব সম্ভবত পেশী ও স্নায়ুর সংযোগস্থলে ল্যাকটিক অ্যাসিড, কঠিন ডাইঅক্সাইড কিংবা অন্য কোনও অবসাদক সামগ্রীর উদ্ভবের জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু সমগ্র দেহের ক্লান্তি ঘটে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদের জন্য। পেশীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার জন্য ল্যাকটিক অ্যাসিডের লোপ এবং বিনষ্ট গ্লাইকোজেন ও ক্রিয়েটিন ফস্‌ফেটএর পুনরুদ্ভব একান্ত আবশ্যক। ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক পেশীতে সংকোচনের সময় একই ভাবে রাসায়নিক পরিবতন ঘটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর পেশীতে অতি অল্পই গ্লাইকোজেন নষ্ট হয় ও সেই অনুপাতে ল্যাকটিক অ্যাসিডও কম জন্মায় ব'লে সংকোচনের সময় খুবই কম কর্ম-শক্তি উৎপন্ন হয়। সংকোচনকালে পেশীতে সর্বদাই কিছু-না-কিছু অম্লের সৃষ্টি হয়, এজন্য এরূপ অম্লত্ববৃদ্ধিহেতু পেশী যাতে সহজে অবসন্ন হতে না পারে তার জন্য তাতে ক্রিয়েটিন, প্রোটিন, বাইকার্বোনেট, ডাইফস্‌ফেট প্রভৃতি ক্ষারধর্মী বস্তু বর্তমান থাকে। পেশীর সংকোচনের জন্য অক্সিজেনের কোনও আবশ্যকতা না থাকলেও সক্রিয়তাহেতু অবসাদের পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে হলে অক্সিজেন না হলে চলে না।

(গ) চর্ম—মসৃণ ত্বক দেহের সর্বাপেক্ষা বহিরাবরণরূপে ইহার সৌন্দর্যের জন্য অনেকটা দায়ী। দেহের কোন কোন অংশে চামড়া পাতলা থাকে, আবার কোনও অংশে উহা অপেক্ষাকৃত পুরু হয়। আবার কোথাও সর্বদা ঘষা লেগে লেগে এর উপরের স্তরটি ক্রমশ কঠিন হয়ে যায় ; নখ, শিং প্রভৃতি এইভাবে পরিবর্তিত চামড়া ব্যতীত

আর কিছুই নয়। চামড়ার বাহিরে, দেহের অনেকাংশে লোম দেখতে পাওয়া যায়, তাদের প্রত্যেকের নীচে একটি ক'রে লোমকূপ আছে।

চামড়ার মধ্যে নিম্নস্তরে অবস্থিত স্বেদ-গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ ঘামরূপে এগুলি দিয়ে বাহিরে আসে, এবং ঘামের পরিমাণ অনেকটা আবহাওয়ার উত্তাপ, আর্দ্রতা, শারীরিক পরিশ্রম এবং মানসিক অবস্থার উপরও নির্ভর করে। দেহের উত্তাপ কতকটা চামড়া হতে পরিবহন ও বিকিরণের জন্য (conduction and radiation) এবং কতকটা ঘামের সঙ্গেও দেহ হতে বের হতে থাকে ব'লে দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষার জন্য ইহা একটি অত্যাবশ্যক দেহাংশ। আবার ঘামের সঙ্গে দেহের অনেক অসার বস্তু এবং লবণ ও জলও বের হয়ে যায় ব'লে ইহা

রেচন-যন্ত্রের (excretory system)ও একটা বিশেষ অংশ বটে। ব্যাঙ প্রভৃতি কোন কোন প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজও কতকটা চামড়ার সাহায্যে হয়ে থাকে। অধিকন্তু চামড়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটি অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় ব'লে পরিচিত। ইহার নিম্নস্তরে যে সকল বিশেষ স্পর্শ-কণা (touch corpuscle) অবস্থিত, কোন বস্তু চামড়ার সঙ্গে লাগলেই ঐ কণা-সংলগ্ন স্নায়ুগুলি কণা হতে ঐ অনুভূতি মস্তিষ্কের সংজ্ঞাকেন্দ্রে পৌঁছায় ব'লেই স্পর্শ অনুভূতি ঘটে। এ ছাড়া, একইভাবে অন্য প্রকার কণার দ্বারা শীত অথবা উত্তাপ অথবা বেদনাবোধও ঘটে। ত্বক চোখের অত্যাবশ্যক সহকারী ইন্দ্রিয়, কেননা চোখে দেখে কোন বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়, এবং সম্পূর্ণতা ঘটে ত্বকের সাহায্যে। যার দৃষ্টিশক্তি নেই, সে কেবল স্পর্শ ক'রেই সকল বস্তুর আকার বুঝতে পারে।

২

শোণিত ও লসিকার সংবহন

হৃৎপিণ্ড ও রক্তপ্রণালীগুলিতে যে গাঢ় লাল তরল পদার্থ সর্বদা সঞ্চালিত হচ্ছে তারই নাম শোণিত। আবার ঐ প্রণালীগুলি যেখানে অসংখ্য ক্ষুদ্র জালকের আকারে কলাকোষগুলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে যে বর্ণহীন তরল পদার্থ থাকে তাকে কলারস অথবা লসিকা (lymph) বলা হয়। ধমনীর শোণিত টকটকে লাল, এবং তা হৃৎপিণ্ড হতে দেহের সর্বাংশে বাহিত হয়ে থাকে, কিন্তু শিরার রক্ত নানা দূষিত পদার্থের জন্য দেখতে কতকটা লালচে বেগুনী রঙের হয়, এবং তার প্রবাহ সর্বদা হৃৎপিণ্ডের দিকে চালিত হয়। রক্তের সঙ্গে খাদ্যের সার

অংশ, প্রণালীহীন গ্রন্থিগুলির (ductless gland) অন্তঃক্ষরণ, এবং দহনক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যক অক্সিজেন গ্যাস দেহের এক অংশ হতে অপর অংশে বাহিত হয়। এবং নানা জীবাণু ও তাদের বিষের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে রক্তের দ্বারাই আত্মরক্ষা সম্ভবপর হয়ে থাকে। আবার রক্তের সাহায্যেই ঐ সকল জীবাণু, তাদের বিষ কিংবা দেহের মধ্যে অপর যে সকল দূষিত পদার্থ আপনি জন্মায় তাদেরও বহিষ্কার ঘটে। একই ভাবে লসিকাও সময় সময় কোন কোন খাদ্যের সারাংশ দেহের এক স্থান হতে অপর স্থানে নিয়ে গিয়ে যেমন পরিপুষ্টির সাহায্য করে আবার তেমনি কলাকোষ হতে নানা দূষিত পদার্থকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করে।

রক্তের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদান কয়টি দেখিতে পাওয়া যায়।—

(১) লোহিতকণিকা (red corpuscle)—রক্তে এরূপ অসংখ্য কণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন নামক লাল রঞ্জক পদার্থ থাকে, তারই জন্য রক্তের স্বাভাবিক রঙ গাঢ় লাল দেখায়। এরই সাহায্যে বায়ু হতে অক্সিজেন দেহকোষে গিয়ে পৌঁছয়, এবং সেখান হতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস ফুসফুসে এসে নিশ্বাসের সঙ্গে দেহ হতে বেরিয়ে যায়। এই কণিকাগুলি যখন স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক ভাবে যকৃতের মধ্যে নষ্ট হয়, তখন এর লৌহাংশ-মুক্ত অপর অংশ হতে পিত্তের বর্ণসামগ্রী বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিনের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

(২) শ্বেতকণিকা (white corpuscle)—লোহিত কণিকার অনুপাতে আকারে এরা বড়, এদের সংখ্যা অনেকটা কম, এবং নিউক্লিয়স ও আকারের তারতম্য হেতু এদের প্রকারভেদও দেখা যায়। রোগের জীবাণু ও তাদের বিষের হাত হতে এরাই সর্বদা রক্ষা করবার চেষ্টা করে। জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধে এদের পরাজয়ে রোগ জন্মে এবং যখন

এরূপ যুদ্ধে শ্বেতকণিকার বিনাশ ঘটে, তখন তারা পূঁজের আকার ধারণ করে।

(৩) অনুচক্রিকা (platelets)—এগুলি আকারে অতি ছোট এবং রক্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে। ক্ষতস্থানে এরা শ্বেত-কণিকার সঙ্গে জড়ো হয়ে, ক্যালসিয়মের উপস্থিতিতে রক্তরসের প্রোথ্রম্বিন নামক উপাদানকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে। তাতেই রক্তরসের ফাইব্রিনোজেন নামক উপাদান হতে ফাইব্রিন প্রস্তুত হয়, এবং এইভাবে কণিকাগুলি জড়ো হয়ে, ঐ স্থানে রক্ত গাঢ় জমাট ভাব ধারণ করে। ইহারই নাম তঞ্চন-প্রক্রিয়া (coagulation)।

(৪) রক্তরস (plasma)—কণিকাগুলি ব্যতীত রক্তে যে স্বচ্ছ গাঢ় তরল অংশ আছে, তারই নাম রক্তরস। এই রক্তরস হতেই লসিকার উৎপত্তি হয়। ক্ষারধর্মী এই তরল অংশ প্রোটিন, শর্করা, স্নেহ (fat), ধাতব লবণ, ইউরিয়া প্রভৃতি অসার পদার্থ, প্রণালীহীন গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ, কতকগুলি এনজাইম, রোগপ্রতিষেধক নানা বস্তু এবং অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসও দ্রবীভূত হয়ে আছে। রক্তের তঞ্চনের পর যখন তাতে আর ফাইব্রিনোজেন অংশ থাকে না তখন যে জলীয় অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাকে রক্তমস্তু বা সিরম বলে।

সংবহন প্রক্রিয়া

এর জন্য বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদযন্ত্রটিই প্রধান। এটি দেখতে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, আড়াই ইঞ্চি চওড়া এবং আড়াই ইঞ্চি পুরু একটা পেশীময় থলের মতো। ভ্রূণাবস্থা হতে মানব দেহের মৃত্যু পর্যন্ত এই যন্ত্রটি কখনো স্থির থাকে না, সর্বদাই পাম্প করে রক্তস্রোতকে ঠেলে দিচ্ছে ধমনীগুলির মধ্যে। বাম দিকে বুকের উপর হাত দিলে

আমরা প্রতি মিনিটে ৭২-৮০ বার যে ধুক্‌ধুক্ অনুভব করি, তারই নাম হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ডান ও বাম দিকে দুটি ক'রে চারটি বিশিষ্ট অংশ দেখতে পাওয়া যায়, এদের উপরকার দুটির নাম অলিন্দ (auricle) এবং নীচেকার দুটির নাম নিলয় (vertricle)। উভয় দিকের অলিন্দ ও নীচেকার নিলয়ের মধ্যে এমন ভাবে দুটি কপাটক (valve) আছে, যাতে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক অবস্থায় কেবল অলিন্দ হতে ঐ দিকের নিলয়েই প্রবেশ করতে পারে, এবং বিপরীত ভাবে কখনই নিলয় হতে অলিন্দে যেতে পারে না।

ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দুটি (superior and inferior venæ cavæ) যখন ডান দিকের অলিন্দে দূষিত রক্ত নিয়ে আসে, তখন ঐ রক্ত কপাটক-পথে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে, এবং ঐ নিলয়-সংযুক্ত ফুসফুস ধমনীর কপাটক-পথে রক্তপ্রবাহ ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগে এবং অক্সিজেন সংযোগে যখন রক্তের সংশোধন হয়, তখন তা পুনরায় ফুসফুসের চারিটি শিরার সাহায্যে বাম অলিন্দে এসে প্রবেশ করে, এবং সেখান হতে মধ্যবর্তী কপাটক-পথে ঐ রক্ত বাম দিকের নিলয়ে গিয়ে পৌঁছয়। বাম নিলয়ের উপরিভাগে মহাধমনী (aorta) সংযুক্ত আছে, এবং এদের উভয়ের সংযোগ স্থলে যে কপাটকযুক্ত ছিদ্রপথ আছে, প্রতি হৃৎস্পন্দনে তার মধ্যে প্রায় চার আউন্স রক্ত প্রবেশ করে এবং মহাধমনী হতে ক্রমশ শাখা ও প্রশাখা ধমনীতে সঞ্চালিত হয়ে অবশেষে অসংখ্য জালকের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়। তৎপরে কলাকোষের সহিত অসার ও সার বস্তুর আদানপ্রদানের পর দূষিত রক্ত প্রশাখা ও শাখা শিরা-পথে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরায় এবং সেখান

হতে ডান দিকের অলিন্দে গিয়ে প্রবেশ করে। এইভাবে শোণিত-প্রবাহের মিনিটে প্রায় ৭২ বার সর্বদেহে সংবহন ঘটে।

রক্তরস হতে উৎপন্ন লসিকাও একইভাবে অসংখ্য সূক্ষ্ম লসিকায়নীর দ্বারা প্রথমে বৃহৎ লসিকায়নীতে এবং তা হতে গ্রীবাদেশের শিরার রক্তস্রোতে মিশে থাকে।

এক ধমনী হতে উহার শাখাগুলিতে রক্তস্রোত সঞ্চালনের জন্য, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনশক্তি ব্যতীত ধমনীর নিজস্ব স্থিতিস্থাপকতাগুণও অনেকটা দায়ী। আবার শিরার মধ্যে রক্তস্রোত এবং লসিকায়নীর মধ্যে লসিকাস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহের জন্য পেশীর সংকোচন, ঐ সকল প্রণালীর স্থানে স্থানে কপাটকের অবস্থিতি এবং বুকের মধ্যে উহাদের উপর অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কম চাপ প্রভৃতি দায়ী।

সংবহনকালে রক্তপ্রণালীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ যে পরিমাণ শক্তিতে ঠেলা দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে, তারই নাম রক্তের চাপ। সাধারণত হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা, শক্তি ও উৎক্ষিপ্ত রক্তের পরিমাণ, রক্তপ্রণালীর প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা, রক্তের গাঢ়ত্ব, এবং রক্তস্রোতের উপর আরোপিত বহিঃপ্রতিরোধই রক্তের চাপের স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। এই দেশে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকালীন রক্তের স্বাভাবিক চাপ $\frac{\text{বয়স}}{২} + ১০০$ মিলিমিটার (পারদ)। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে নানা কারণে স্বাভাবিক অবস্থায়ও এর ব্যতিক্রম হতে পারে। পুরুষের রক্তের চাপ সমবয়স্ক রমণীর রক্তের চাপ হতে কিছু (১০-১৫ মিলিমিটার) বেশী হয়। শীতল জলে স্নানের পর শাখাধমনীগুলি সংকুচিত হয় ব'লে রক্তের চাপ যেমন কিছু বাড়ে, আবার তেমনি উষ্ণ জলে স্নানের পর তাদের প্রসারণ সত্ত্বেও হৃৎস্পন্দনের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলেও উহা একটু বাড়ে। ব্যায়ামের প্রথম অবস্থায় কতকটা বাড়ে কিন্তু পরে অবসন্নতার জন্য কমে যায়। খাদ্য

গ্রহণের পরও কিঞ্চিৎ বাড়ে। নিদ্রার সময় চাপ প্রথমে একটু কমলেও পরে বেড়ে ওঠে। অকস্মাৎ শয়ান অবস্থা হতে উঠে দাঁড়ালেও কমে যায়; আবার মানসিক চিন্তা উৎকণ্ঠা প্রভৃতিতে কতকটা বাড়ে। ঋতুকালে মেয়েদের রক্তের চাপ যেমন কম থাকে, আবার গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালে তেমনি কতকটা বেড়ে যায়।

৩

শ্বসন-ক্রিয়া

নাসিকার দুটি ছিদ্রপথে এবং সময় সময় মুখ দিয়ে আমরা দেহের মধ্যে যে বায়ু টেনে নিই তা প্রথমে পশ্চাতস্থ গলবিলে (pharynx) প্রবেশ করে। নাকের মধ্যে কতকগুলি লোম থাকে, এবং সেগুলি সর্বদাই আর্দ্র থাকে ব'লে বায়ুর সঙ্গে ধূলিকণা বা কয়লার গুঁড়ো প্রভৃতি প্রবেশ করলে ঐখানেই আটকে যায়, পরবর্তী শ্বাসনালী (trachea and bronchi) কিংবা ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু কোনও কারণে নাসাপথ (nares) বন্ধ হয়ে গেলে, মুখের দ্বারাই বায়ু দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, তখন ঐ সকল অনিষ্টকর বস্তু একেবারে সোজাসুজি গলবিল হতে শ্বাসনালী, এবং সেখান হতে ফুসফুসের মধ্যে চ'লে যায় বলে যতদূর সম্ভব এভাবে প্রশ্বাস গ্রহণ না করাই উচিত।

গলবিলের নীচের দিকে দুটি মুখ আছে, সম্মুখে শ্বাসনালীর এবং পশ্চাতে খাদ্যনালীর (œsophagus)। পানাহারের সময় যাতে খাদ্য বা পানীয় শ্বাসনালীতে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য শ্বাসনালীর

মুখে একটা ঢাকনা থাকে ; খাওয়ার সময়ে তা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। যদি কোন কারণে অসাবধান মুহূর্তে কোন খাদ্যকণা কিংবা অন্য কিছু
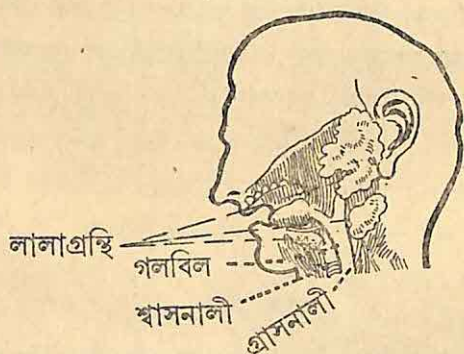
শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ বাহিরে ঠেলে দেওয়ার জন্য সজোরে যে কাশি ওঠে, তাকে "বিষম লাগা" বলে।

শ্বাসনালীটি প্রথমে বড় দুটি অংশে বিভক্ত হয়, তৎপরে ঐ শাখানালী (bronchi) দুটি হতে অনেকগুলি প্রশাখানালী (bronchioles) উৎপন্ন হয়ে দুই দিকের ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। এইভাবে বায়ু ভিতরে পৌঁছিলে ফুসফুস দুটি ফুলে ওঠে, আবার পরক্ষণে বায়ু যখন বিপরীত দিকে বাহিরে যায়, তখন তারা পুনরায় চুপসে যায়। ফুসফুস দুটি একটি পাতলা আবরণের দ্বারা ঢাকা থাকে, তার নাম ফুসফুসধরা কলা (pleura)। ডান দিকের ফুসফুসের তিনটি এবং বাম ফুসফুসের দুটি খণ্ড আছে, আবার প্রত্যেকটি খণ্ড অসংখ্য বায়ুকোষে পূর্ণ। ঐ বায়ুকোষগুলির চারিদিকে অসংখ্য জালক তাদের ঘিরে থাকে ; এইভাবে গৃহীত বায়ুর সঙ্গে রক্তের আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটে থাকে।

শ্বসন-ক্রিয়ার প্রথম অংশ অর্থাৎ বায়ুগ্রহণকে প্রশ্বাস (inspiration)

এবং দ্বিতীয় অংশ বায়ুর বহিষ্কারকে নিশ্বাস (expiration) বলে। প্রত্যেক প্রশ্বাসের সময় যখন বুক ফুলে ওঠে, তখন উদরগহ্বর ও বুকের মধ্যবর্তী মধ্যচ্ছদা (diaphragm) নামক পেশী নীচের দিকে নেমে যায় ব'লে পেটও সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ওঠে। আবার নিশ্বাস ত্যাগকালে মধ্যচ্ছদা উপরে উঠে যায় ব'লে পেট ও বুকের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। প্রতি মিনিটে এইভাবে সাধারণত ১৮-২০ বার শ্বসন-ক্রিয়া চলতে থাকে এবং বায়ু হতে দেহের আবশ্যকমত অক্সিজেন গৃহীত হয়, ও দেহে উৎপন্ন কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বহিষ্কার ঘটে।

৪

খাদ্য ও তাহার পরিপাক

দেহের বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য খাদ্যগ্রহণ অত্যাবশ্যক, কেননা এক দিকে খাদ্য হতে যে উত্তাপ জন্মে, তাই রূপান্তরিত হয় কর্মশক্তিতে, আবার অন্য দিকে ঐ খাদ্যের সারাংশ হতেই দেহের ক্ষতি নিবারণ ও পরিপুষ্টি লাভ হয়। ভাইটামিন প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ উপাদানের দ্বারা কোন কোন রোগের প্রতিষেধও হয়ে থাকে। এইজন্যই নিয়মিতভাবে পরিমাণে ও গুণানুসারে খাদ্যগ্রহণ অবশ্যকর্তব্য।

আমরা সাধারণত যে সকল খাদ্য খাই, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে, যথা :—

(১) প্রোটিন (proteins)—মাংস, মাছ, ছানা, দুধ, ডিম প্রভৃতি প্রাণিজ এবং দাল, আটা, চাউল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ খাদ্যে এই উপাদান পাওয়া যায়।

(২) শর্করা (carbohydrates)—গম, চাউল, যব, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতিতে এই উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

(৩) স্নেহ (fats)—ঘি, মাখন, চর্বি প্রভৃতি প্রাণিজ এবং তৈলাদি উদ্ভিজ্জ সামগ্রী এই জাতীয় উপাদান।

(৪) লবণ (salts)—খাদ্যলবণ খাদ্যের আস্বাদ ব্যতীত অন্যান্য নানা কারণেও খাওয়া উচিত। প্রায় প্রত্যেক খাদ্যেই কিছু না কিছু লবণজাতীয় বস্তু থাকে।

(৫) ভাইটামিন (vitamins)—দেহের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কতকগুলি রোগের প্রতিষেধের জন্য এই জাতীয় উপাদান না হলে চলে না। এদের আবার অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে, যথা—

(ক) 'এ' জাতীয়—দুধ, মাখন, কড়, হ্যালিবাট ও হাঙ্গরের যকৃৎ-তৈলে, এবং ডিমের কুসুমে থাকে। তা ছাড়া গাজর, আম, পেঁপে ও শাকসবজিতে যে কেরোটিন নামক পদার্থ থাকে, তা হতে এই ভাইটামিন অনায়াসে দেহে উৎপন্ন হতে পারে। নানা চক্ষুরোগ ও ফুসফুস রোগের প্রতিষেধের জন্য এবং দেহের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য এর প্রয়োজন।

(খ) 'বি'$_1$ জাতীয়—অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ প্রভৃতি দালে, ঢেঁকিছাঁটা চাউলে, এবং জাঁতা-ভাঙা আটায় থাকে। এর অভাবে দেহের ঠিক পরিপুষ্টি হয় না, বেরিবেরি, অজীর্ণ ও অম্লরোগ প্রভৃতি দেখা যায়।

'বি'$_2$ জাতীয়—দুগ্ধজ সকল খাদ্যে, মাংস, ডিম, দাল প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং খাদ্যে অভাব হলে 'প্যালেগ্রা' রোগ, মুখে ও জিভে ঘা হয়।

(গ) 'সি' জাতীয়—আমলকী, পেয়ারা, কমলালেবু, পাতিলেবু

বিলাতি বেগুন ও লঙ্কা প্রভৃতি ফলে এবং অঙ্কুরিত মুগ, ছোলা প্রভৃতি দালে খুবই থাকে। এর অভাবে 'স্কার্ভি' নামক রোগ জন্মে।

(ঘ) 'ডি' জাতীয়—কডলিভার অয়েল, হ্যালিবাট ওয়েল ও হাঙ্গরের যকৃত-নিঃসৃত তৈলে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। সূর্যালোকে দেহের মধ্যেও ইহা প্রস্তুত হয়ে থাকে, এবং কোন কারণে অভাব ঘটলে 'রিকেট্স' নামক রোগ হয়।

(৬) 'ই' জাতীয়—মটর, চা, লেটুস শাক ও অঙ্কুরিত গমে যথেষ্ট থাকে। এর দ্বারা বন্ধ্যাত্ব দূর হয় এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে।

(৭) 'কে' জাতীয়—এটি নানাপ্রকার উদ্ভিদ্-কোষে এবং আলফাল্‌কা নামক এক প্রকার তৃণে প্রচুর পরিমাণে থাকে। খাদ্যে এর অভাবে রক্তের তঞ্চন বিলম্বিত হয় ব'লে আঘাতের পর অনেকক্ষণ রক্তপাত হতে থাকে।

(৮) 'পি' জাতীয়—প্রায়শ ভাইটামিন 'সি'র একই সঙ্গে থাকে এবং খুব সম্ভবত, জালকে রক্তপাত হতে থাকলে ভাইটামিন 'সি'র সহায়করূপে ঐ রক্তপাত বন্ধ করে।

ভাইটামিনগুলির মধ্যে 'এ' 'ডি' 'ই' ও 'কে' স্নেহপদার্থে দ্রবণীয় এবং 'বি'-সমষ্টি, 'সি', ও 'পি' জলে দ্রবণীয় ব'লে পরিচিত। 'সি' ও 'পি' অতি সহজেই উত্তাপের দ্বারা নষ্ট হয়, কিন্তু 'ডি' ও 'ই'র উপর উত্তাপের কোনও অনিষ্টকর প্রভাব দেখা যায় না।

খাদ্যের পরিপাক

আমরা মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করি। দাঁতের দ্বারা যখন ঐ খাদ্য খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পেষিত হতে থাকে তখন চোয়ালের দুদিক হতে প্যারোটিড

(parotid) গ্রন্থির, এবং জিভের নীচে অধোহনু ও জিহ্বামূলীয় (submaxillary and sublingual glands) গ্রন্থি হতে লালার নিঃসরণ হতে থাকে। অনেক সময় খাবার না খেলেও কোন ভাল খাদ্যের গন্ধে অথবা মুখরোচক খাদ্যের কথা মনে হলেও জিভে যে জল দেখা যায়, তা ঐ সকল লালাগ্রন্থিরই রস। খাদ্য চিবোতে চিবোতে যখন চটচটে আঠার মত হয় তখন জিভের সাহায্যে এপাশ হতে ওপাশে সরিয়ে নিয়ে, তালুতে ঘষে ঘষে একটা ছোট গুলির মত ক'রে নেওয়া যায়। তারপর যখন মুহূর্তের জন্য প্রশ্বাস বন্ধ ক'রে জিভ দিয়ে তাকে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, তখন তা গিয়ে প্রবেশ করে খাদ্যনালীর মধ্যে। এ সময় তালুর পশ্চাতের নরম আবরণটি উপরের দিকে গিয়ে মুখের সঙ্গে নাসিকার সংযোগপথ বন্ধ ক'রে দেয় ব'লে একমাত্র খোলা পথ খাদ্য-নালীতে খাদ্যের প্রবেশ ঘটে, এবং প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কতক তাতে সংকোচন-বিকোচনের জন্য, এবং কতক অভিকর্ষের (gravity) জন্যও পিচ্ছল খাদ্যনালীপথে একেবারে সোজাসুজি গিয়ে পৌছয় পাকস্থলীর অভ্যন্তরে।

সুসিদ্ধ শ্বেতসার (ভাত, রুটি প্রভৃতি) ব্যতীত অন্য কোনও উপাদানের খাদ্যের পাকস্থলীতে না পৌছা পর্যন্ত পরিপাক আরম্ভ হয় না। লালারসে টায়ালিন নামক যে শর্করাভঞ্জক এন্‌জাইম থাকে, তাতেই সুসিদ্ধ শ্বেতসার কতকটা মল্টোজে রূপান্তরিত হয়। এইজন্য ভাত কিংবা রুটিকে খানিকক্ষণ চিবোতে থাকলে তা কতকটা মিষ্টি লাগে। এইভাবে শর্করাজাতীয় খাদ্যের আংশিক পরিপাক পাকস্থলীর প্রথমাংশেও হতে দেখা যায়।

পাকস্থলীর মধ্যে প্রোটিন জাতীয় উপাদানের পরিপাকই সর্বাপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে। মধ্যাংশে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নির্গম মুখের

নিকটে যে পেপসিন (pepsin) এন্‌জাইমপূর্ণ রস নিঃসৃত হয়, তারই ফলে প্রোটিনের আংশিক পরিপাক সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত পাকস্থলীতে দুগ্ধের তঞ্চক রেনিন (rennin) নামক আর একটি এন্‌জাইম থাকে, যাতে অতি সহজেই দুধের পরিপাক সম্ভবপর হয়। পাচকাম্লরসে (gastric juice) অল্পপরিমাণে স্নেহ-ভঞ্জক এন্‌জাইম (fat-splitting enzyme) থাকলেও, পাকস্থলীর মধ্যে স্নেহের অতি অল্পই পরিপাক ঘটে; কেবল আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও সংকোচন-বিকোচনের ফলে ঐ জাতীয় উপাদান অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়ে অবদ্রব (emulsion) অবস্থায় ভাসতে থাকে।। পাকস্থলীতে খাদ্য প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাচীরের মধ্যপ্রদেশ হতে একটি সংকোচনের ঢেউ খেলে যায় নির্গম মুখ পর্যন্ত, এবং তার সঙ্গে গ্রহণীর (duodenum) সংযোগপথ কপাটকের (pyloric valve) দ্বারা বন্ধ থাকাতে, খাদ্যের আলোড়ন প্রতিহত হয়ে পুনরায় পাকস্থলীর মধ্যাংশে ফিরে যায়। এভাবে প্রতি সেকেণ্ডে ১৫-২০টি তরঙ্গ নির্গম মুখ হতে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। প্রায় আধঘণ্টা পরে যথেষ্ট পরিমাণে পাচকাম্লরসের ক্ষরণহেতু ঐ বন্ধদ্বার সহসা খুলে যায়, এবং কতকটা খাদ্য গ্রহণীর মধ্যে প্রবেশ করামাত্র আবার উহা বন্ধ হয়। এভাবে খাদ্য অতি অল্পমাত্রায় ধীরে ধীরে গ্রহণীতে প্রবেশ করে, এবং সেখানে উহার সম্যক পরিপাকের সুযোগ হয়। সাধারণত খাদ্য প্রায় ৩-৪ ঘণ্টা কাল পাকস্থলীতে থাকে। জল, গ্লুকোজ, লবণ ও ভাইটামিন ব্যতীত অপর কোনও উপাদান পাকস্থলী হতে রক্তের সহিত মিশতে পারে না।

পাকস্থলীর পরেই প্রায় বারো আঙুল লম্বা গ্রহণী অন্ত্রের এবং তৎপরে ক্ষুদ্রান্ত্রের (small intestine) অবস্থান। এই অংশেই সকল-প্রকার উপাদানের পরিপাকক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। গ্রহণীর

অন্তরাবরণে যে সিক্রিটিন-পূর্ব (pro-secretin) উপাদান থাকে, পাচকাম্লরসের প্রভাবে উহা যখন সিক্রিটিন (secretin) নামক উত্তেজক
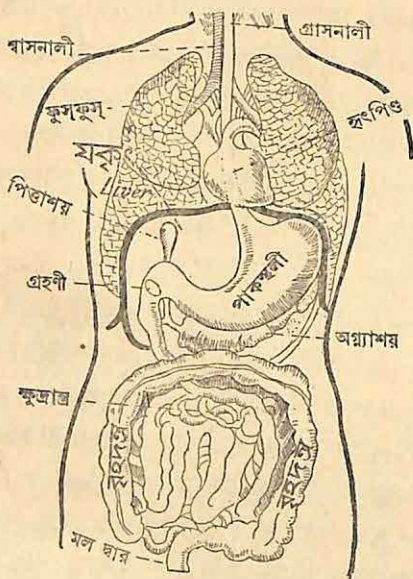
বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তখন তা রক্তের সঙ্গে মিশে গ্রহণী-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরিত রসকে প্রচুর পরিমাণে অন্ত্রের মধ্যে টেনে আনে। এই অগ্ন্যাশয়-রসে (pancreatic juice) ট্রিপসিন-পূর্ববর্তী যে সামগ্রী (trypsinogen) থাকে, আন্ত্রিক উত্তেজক উপাদানের (enterokinase) দ্বারা তাই সক্রিয় এন্‌জাইম ট্রিপসিনে রূপান্তরিত হয়, এবং তারই সাহায্যে পাকস্থলীতে অজীর্ণ প্রোটিনের পরিপাক সাধিত হয়, এবং অতঃপর এই উপাদানের যে অংশ অভগ্ন অবস্থায় থাকে, আন্ত্রিক রসের ইরেপসিন (erepsin) নামক উপাদান প্রোটিনের

পরিপাক সম্পূর্ণ ক'রে তাকে অবিভাজ্য অংশ এমাইনো অ্যাসিডে (amino acid) পরিণত করে। অগ্ন্যাশয়-রসে এমাইলেজ (amylase) নামক শর্করাভঞ্জক যে এন্‌জাইম থাকে, তারই দ্বারা এই জাতীয় খাদ্য গ্লুকোজে পরিণত হয়। আবার এতে স্নেহভঞ্জন লিপেজ (lipase) নামক যে এন্‌জাইম থাকে, পিত্তকোষ হতে অন্ত্রে আগত পিত্তের সহায়তায় তা স্নেহজাতীয় উপাদানকে, স্নেহজ-অ্যাসিড ও গ্লিসারলে (fatty acid & glycerol) রূপান্তরিত করে। একই ভাবে আন্ত্রিক-রসের লিপেজ-স্নেহজাতীয় উপাদানকে অ্যাসিড ও গ্লিসারলে, এবং মল্টেজ (maltase) ল্যাকটেজ (lactase) ও সুক্রেজ (sucrase) দ্বিশর্করাগুলিকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

খাদ্যাংশগুলির শোষণ (absorption) ও পরবর্তী ক্রিয়া

প্রোটিন জাতীয় উপাদানের সূক্ষ্মাংশ এমাইনো অ্যাসিড, শর্করা-জাতীয় উপাদানের অবিভাজ্য অংশ গ্লুকোজ, এবং স্নেহজাতীয় উপাদানের শেষ পরিণতি স্নেহজ অ্যাসিড ও গ্লিসারল সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তরাবরণ ভেদ ক'রে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। তৎপরে ঐ পরিশোষিত এমাইনো অ্যাসিড হতে প্রধানত দেহের পেশীর পরিপুষ্টি লাভ হয়, এবং পরিমাণে অধিক হলে, অথবা অন্যজাতীয় উপাদানের অভাব হলে দেহের উত্তাপ ও কার্যক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে। শেষোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত এমাইনো অ্যাসিড হতে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন প্রভৃতি যে সকল অসার বস্তু উৎপন্ন হয়, মূত্রের সঙ্গে তাদের বহিষ্কার ঘটে। গ্লুকোজ রক্তপ্রবাহের সঙ্গে যকৃতে গিয়ে গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয় এবং যকৃতে ও পেশীতে সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজন-মত দেহের উত্তাপ ও কার্যক্ষমতার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে
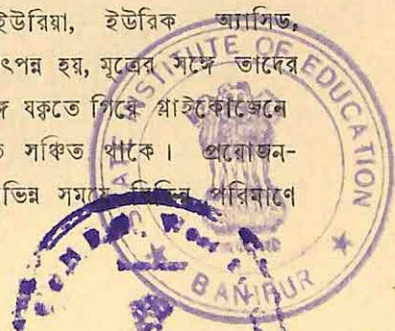
গ্লাইকোজেন হতে পুনরায় গ্লুকোজের সৃষ্টি হয়, এবং নিজ কাজ শেষ ক'রে অঙ্গারাম্ল ও জলের আকারে যথাক্রমে নিশ্বাস ও মূত্রের সঙ্গে দেহ হতে নির্গত হয়। স্নেহজ অ্যাসিড ও গ্লিসারল পুনরায় একত্রিত হয়ে দেহের চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। কখন কখন অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময় চর্বি হতেও দেহের উত্তাপ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্ষমতা উৎপন্ন হয়ে থাকে, এবং পরিণামে জল ও অঙ্গারাম্লরূপে দেহ হতে বের হয়ে যায়।

অন্ত্রের সঞ্চলন (Movements of the intestines)

পরিপাকের সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর সঞ্চলনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পরিপাক-কালে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যেও নানা প্রকার সংকোচন-বিকোচন তরঙ্গের ফলে শুধু যে খাদ্যগুলিতেই সবেগে আলোড়ন চলিতে থাকে এমন নয়, ভুক্ত দ্রব্য ক্রমশ নীচের দিকে স'রে গিয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যবর্তী কপাটকযুক্ত রুদ্ধদ্বারে আঘাত করতে থাকে। পাকস্থলীর নির্গমদ্বারের ন্যায় এই দ্বারও সব সময় খোলা থাকে না, সুতরাং সমগ্র খাদ্যও একসঙ্গে বৃহদন্ত্রে ঢুকতে পারে না। ফলে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে সকল উপাদানের পরিপাক অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। ৫-৮ ঘণ্টার মধ্যে এইভাবে পরিপাক ও পরিশোষণের পর খাদ্যাবশিষ্ট বৃহদন্ত্রের প্রবেশদ্বার অতিক্রম ক'রে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে।

বৃহদন্ত্রে (large intestine) প্রবেশের পর খাদ্যাবশিষ্ট বিপরীতগামী সংকোচন-বিকোচন-তরঙ্গের ফলে অনেকক্ষণ বৃহদন্ত্রে থাকবার সুযোগ পায়, সুতরাং অপরিশোষিত অংশের, বিশেষত জলীয় ভাগের সম্যক শোষণ ঘটে। এখানে বিশেষ কোন পরিপাকক্রিয়া

দেখা যায় না, কেবল প্রোটিনের যে অংশ অজীর্ণ অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করে, জীবাণুর সাহায্যে তাকে এমাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরের শেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিনল, ইণ্ডল, ক্রিজল প্রভৃতি কতকগুলি দূষিত পদার্থেরও সৃষ্টি হয়। যকৃতের মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড অথবা গ্লাইকুরোনিক অ্যাসিড এই সকল অনিষ্টকর বস্তুর সঙ্গে মিশে এদের নির্দোষ বস্তুতে পরিণত করে। কারো কারো মতে বৃহদন্ত্রে এই ভাবে জীবাণুর ক্রিয়ার ফলেই আমাদের দেহ ক্ষয় হচ্ছে পলে পলে ও তিলে তিলে, এবং পরিণত বয়সে মৃত্যুর জন্যেও এরা অনেকটা দায়ী—কিন্তু এ সম্বন্ধে সকল বিজ্ঞানী এক মত নন। শর্করাজাতীয় খাদ্যের সেলুলোজ নামক দুষ্পাচ্য অংশেরও জীবাণুর সাহায্যে কতকটা পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হয় বৃহদন্ত্রে। তৎপরে এই জাতীয় কিংবা প্রোটিন অথবা স্নেহজাতীয় যে অংশ অজীর্ণ অবস্থায় থাকে, তা মলের আকারে মলদ্বার-পথে বেরিয়ে যায়।

যকৃতের নীচে বৃহদন্ত্রের বক্রস্থান (hepatic flexure) পর্যন্ত পৌছতে খাদ্যের লাগে চোদ্দ ঘণ্টা, এবং তা প্লীহার নীচে বক্র অংশে (splenic flexure) পৌছয় আঠারো ঘণ্টায় এবং প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় ഗ-আকৃতি বক্র অংশে গিয়ে জমা হয়। এই ভাবে বৃহদন্ত্রে প্রায় দশ ঘণ্টা কাল থাকাতে প্রায় সমস্ত জলীয় অংশ রক্তের দ্বারা শোষিত হয় ব'লে মল স্বাভাবিক শক্ত আকার ধারণ করে। মলদ্বারে (rectum) এই ভাবে জমা হওয়ার ফলে যখন চাপ পড়ে, তখন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে তা স্বাভাবিক মলের আকারে বেরিয়ে যায় শরীর হতে।

খাদ্যের পরিপাক সম্বন্ধে পিত্তের সাহচর্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রোটিন, শর্করা এবং মুখ্যত স্নেহজাতীয় উপাদানের পরিপাকের ও শোষণের সাহায্য ক'রে পিত্তের কতক অংশ রক্তের সঙ্গে আবার

যকৃতে গিয়ে পুনরায় পিত্ত-সৃষ্টির সহায়তা করে। আবার যে অংশ খাদ্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রান্ত্র হতে বৃহদন্ত্রে চ'লে যায়, জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে তা হতে স্টেরকোবিলিন (stercobilin) নামক এক প্রকার মল-রঞ্জক পদার্থ এবং ইউরোক্রোল ও ইউরোবিলিন নামক অপর দুটি মূত্র-রঞ্জক পদার্থের উৎপত্তি হয়। মল এবং মূত্রের স্বাভাবিক রঙ (urochrome & urobilin) এই সকল পিত্তস্থ বর্ণদ্রব্যের জন্যই হয়ে থাকে।

৫

যকৃত ও প্লীহা

মধ্যচ্ছদার নীচে উদরগহ্বরের উপরিভাগে ডান দিকে দেহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎগ্রন্থি যকৃত এবং বাম দিকে প্লীহা অবস্থিত। এদের দ্বারা দেহের অনেকগুলি অত্যাবশ্যক ক্রিয়া সাধিত হয়। যকৃতের মধ্যে পিত্তপ্রণালী আছে, কিন্তু প্লীহার অনুরূপ কোনও প্রণালী নাই।

(১) রক্তসংক্রান্ত কার্যাবলী—সাধারণত যকৃৎ-কোষে এবং সময় সময় প্লীহা-কোষেও পিত্তরস উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভ্রূণাবস্থায় প্লীহা ও যকৃতের মধ্যে লোহিত কণিকার সৃষ্টি হয়, কিন্তু জন্মের পর ঐ সকল কণিকা রক্তোৎপাদনকারী উপাদানের আধাররূপে কাজ করে। লোহিত কণিকার রঞ্জক-পদার্থ হিমোগ্লোবিন এবং রক্তরসের ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিনও যকৃতেই উৎপন্ন হয়। প্লীহা ও যকৃতের মধ্যে প্রাচীন ও বিকৃত রক্তকণিকার বিনাশ ঘটে, এবং হিমোগ্লোবিন হতে মুক্ত লৌহ এই দুই গ্রন্থিতে সঞ্চিত থাকে। উভয় গ্রন্থির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রোতের জন্য তারা কতকটা রক্তের সঞ্চয়-ভাণ্ডার-

রূপে হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত রক্তের চাপ হতে রক্ষা করে। প্লীহার মধ্যে জীবাণু ও বিষের প্রতিষেধক, বিশেষত স্বাভাবিক লোহিত কণিকা ধ্বংস-প্রতিষেধক, বস্তু প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং যকৃতে তঞ্চন-প্রতিষেধক হিপারিন অথবা প্রোথ্রম্বিন বিরোধী সামগ্রী উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত প্লীহা অনেক সময় রক্তের ছাঁকনির মত কাজ করে, যাতে রক্তের জীবাণু কিংবা অনিষ্টকর অন্যান্য বস্তু প্লীহার মধ্যেই থেকে যায়, এবং এই ভাবেই তাদের দ্বারা আর রক্ত দূষিত হতে পারে না।

(২) বিপাকঘটিত ক্রিয়া—খাদ্যসম্ভূত প্রয়োজনাতিরিক্ত এমাইনো অ্যাসিড হতে যকৃতের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিক ক্রিয়েটিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়ে থাকে। রক্তে শোষিত গ্লুকোজ যকৃতের মধ্যে গিয়ে গ্লাইক্লোজেনে পরিবর্তিত হয় এবং এর অধিকাংশই যকৃতের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে। একই ভাবে গৃহীত সম্পূর্ণ চর্বিগুলিরও যকৃতের মধ্যে যখন অসম্পূর্ণতা ঘটে, তখন তা হতে কার্যশক্তির উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। আবার যকৃতের চর্বিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' সঞ্চিত থাকে, এবং এখানেই খাদ্যের পরিপাক কেরোটিন নামক উপাদান হতে ভাইটামিন 'এ' উৎপন্ন হয়।

(৩) দেহরক্ষাসংক্রান্ত কার্য :—খাদ্যের পরিপাক, শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় অথবা কোন কারণে রক্তে অক্সিজেনের অল্পতা, পুনঃ পুনঃ রক্তপাত অথবা কার্বন-মনোক্সাইডের বিষক্রিয়া ঘটলে প্লীহাই বার বার সংকুচিত হয়ে নিজের সঞ্চয়-ভাণ্ডার হতে প্রচুর পরিমাণে লোহিত কণিকাকে রক্তস্রোতে ঠেলে বের ক'রে দিয়ে, ঐ সংকট-মুহূর্তে দেহকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

যকৃৎও নানা ভাবে দেহকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। বৃহদন্ত্রে প্রস্তুত জীবাণুঘটিত—ইণ্ডল, স্কেটল, ফিনল, ক্রিজল প্রভৃতি অপকারী

সামগ্রী যকৃতের মধ্যে সলফিউরিক অথবা গ্লাইকুরোনিক অ্যাসিডের সঙ্গে নির্দোষ যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি ক'রে দেহকে রক্ষা ক'রে থাকে। তা ছাড়া বিষধর্মী ভারি ধাতুগুলি জীবাণুঘটিত এবং রাসায়নিক কতকগুলি বিষও পিত্তরসে ক্ষরিত হয়ে ব'লে ঐ সকল বিষের তীব্রতা হ্রাস হয়।

এই সকল কারণে যকৃত দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু প্লীহাকে ঠিক ততটা অপরিহার্য বলা চলে না, কারণ দেখা যায় যে কোনও কারণে তাকে কেটে ফেলে দিলেও দেহের অন্যান্য অংশের অনুরূপ সজাল অন্তরাবরণীয় কোষের (reticulo endothelial cells) দ্বারা ঐ সকল ক্রিয়া চলতে পারে।

৬

সুসমঞ্জস খাদ্য ও পরিপুষ্টি

খাদ্যের উপাদানগুলির শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই করা হয়েছে। সকল খাদ্যে ঐ সকল উপাদানের সব কটি নাও থাকতে পারে, এজন্যই সাধারণত মিশ্র খাদ্যগ্রহণ বিধেয়। সুতরাং যে খাদ্য-সমষ্টিতে ঐ সকল উপাদানের সব কটি পরিমাণে ও গুণানুসারে উপযুক্তভাবে আছে, তারই নাম সুসমঞ্জস খাদ্য।

(১) খাদ্যের পরিমাণ—বয়স, আবহাওয়া, শারীরিক পরিশ্রম ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক, এবং এইভাবে দেহের প্রয়োজন সাধারণত কেলরির মাপে স্থিরীকৃত হয়। শরীরবিজ্ঞানমতে এক হাজার গ্রাম জলের তাপ মাত্র এক ডিগ্রী বাড়াতে

যতটুকু উত্তাপের আবশ্যক, তাকেই 'কেলরি' (calorie) বলে। প্রতি গ্রাম শর্করা ও প্রোটিন হতে ৪·১ কেলরি এবং প্রতি গ্রাম স্নেহ হতে ৯·৩ কেলরি উত্তাপ জন্মে। একজন মিতশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক প্রায় ২৬০০ কেলরি আবশ্যক। দশ বছর হতে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণত দৈনিক ১৮২০-২০৮০ কেলরি, ছয় হতে নয় বছর পর্যন্ত ১৩০০ হতে ১৫৬০ কেলরি, দুই হতে পাঁচ বছর পর্যন্ত ৭৮০ হতে ১৩০০ কেলরি এবং দুই বছরের কম বয়স্ক শিশুর পক্ষে ৫২০ কেলরি দৈনিক আবশ্যক। স্বাভাবিক অবস্থায় মেয়েদের পুরুষের অপেক্ষা কিছু কম হলেও চলে, কিন্তু গর্ভাবস্থা কিংবা স্তন্যদানকালে ২৬০০-২৮০০ কেলরি আবশ্যক। আবার যাদের অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম করতে হয়, তাদের পক্ষে ২৮০০-৩৬০০ কেলরির প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে খাদ্যতালিকা এমন ভাবে প্রস্তুত করতে হবে যে, প্রয়োজনীয় কেলরির অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় তিন ভাগ স্নেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদান হতে এবং বাকি এক ভাগ মাত্র প্রোটিন হতে পরিপূরণ হতে পারে ; কিন্তু শর্করা ও স্নেহ-উপাদানের মধ্যে ঘি, মাখন প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য ব'লে প্রায়শ ভাত, রুটি প্রভৃতি শর্করাজাতীয় উপাদানের দ্বারাই কম খরচে দেহের প্রয়োজন মিটোতে হয়।

(২) উপাদানের যোগ্যতা—স্নেহ ও শর্করা যেমন কর্মশক্তিদায়ক উপাদান ব'লে পরিচিত, ঠিক তেমনি প্রোটিন, ভাইটামিন ও লবণ-জাতীয় উপাদানগুলি দেহরক্ষক উপাদান ব'লে বিবেচিত হয়। মাছ, মাংস, ছানা, ডিম প্রভৃতি প্রাণিজ প্রোটিনগুলি সহজপাচ্য এবং অনেকটা আমাদের দেহের প্রোটিনের অনুরূপ ব'লে খাদ্যহিসাবে দাল প্রভৃতির উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেয়। সেজন্য আমাদের দৈনিক আবশ্যক প্রায় একশো গ্রাম প্রোটিনের মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক

ভাগ প্রাণিজ হলেই ভাল হয়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সাধারণত দাল হতে অধিকপরিমাণে খেলেও আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ ভাত অথবা রুটি খাই, তার প্রোটিনের পরিমাণও বড় কম নয়। অধুনা দেখা গেছে যে চালের প্রোটিন গমের প্রোটিন হতে দেহক্ষয় পূরণের জন্য অধিকতর উপযোগী, কিন্তু গমের মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ চাল অপেক্ষা বেশি থাকাতে ভাতের সঙ্গে কিছু আটার রুটি খাওয়া ভাল। গুণানুসারে দালগুলির মধ্যে ছোলা ও মুগই সবচেয়ে ভাল। শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি গর্ভিনী ও স্তন্যদাত্রী জননীর পক্ষে প্রোটিনের পরিমাণ কিছু অধিকই গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

উদ্ভিজ্জ ও জৈব স্নেহের মধ্যে কর্মশক্তির উদ্ভবের জন্য কোন পার্থক্য না থাকলেও প্রাণিজ স্নেহে ভাইটামিন 'এ,' 'ডি', 'ই', ও 'কে' প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে ব'লে ঘি মাখন প্রভৃতি শেষোক্ত স্নেহ-পদার্থ খাদ্য-হিসাবে যতটা সম্ভব গ্রহণ করা উচিত।

এতদ্ব্যতীত দেহরক্ষার জন্য, দৈনিক প্রায় এক গ্রাম ক্যালসিয়ম, ও ফসফরস ঘটিত লবণ এবং ২০ মিলিগ্রাম লোহা থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রথম দুই শ্রেণীর লবণ দেহবৃদ্ধির (অস্থিবৃদ্ধি) এবং তামা, মেঙ্গানীজসহ লোহাঘটিত লবণ রক্তের অল্পতা প্রতিরোধের জন্য অত্যাবশ্যক।

এই হিসাবে বিভিন্ন ভাইটামিনের আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এরূপ সকল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত সুসমঞ্জস একটিমাত্র খাদ্য খুঁজে বের করা কঠিন। কেবল দুধ আর ডিম কতকটা এর কাছাকাছি পৌছয়, কেননা এদের মধ্যে দেহরক্ষাকারী ও কর্মশক্তিদায়ক সকল উপাদানই কতকটা থাকে ব'লে এদের আদর্শ খাদ্য ব'লে মনে করা যেতে পারে। দুধে শতকরা চার ভাগ প্রোটিন, যথেষ্ট পরিমাণে

ক্যালসিয়ম ও ফসফরস এবং ভাইটামিন 'এ' 'বি$_2$' ও 'ডি' থাকাতে দেহবৃদ্ধির জন্য শিশুদের পক্ষে দুধ অপরিহার্য খাদ্য। একই কারণে রুগ্ন ও গর্ভবতীর পক্ষেও তা উপযোগী খাদ্য, কিন্তু দুধে জলীয় অংশ এত বেশি যে পরিণতবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে শুধু দুধ পান করে বেঁচে থাকতে হলে এত অধিক পরিমাণে দুধের আবশ্যক যে, তা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়।

ডিমের সাদা এবং হলদে অংশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন আছে, তা ছাড়া কুসুমের স্নেহজাতীয় উপাদান, লবণ ও ভাইটামিন 'এ' 'বি' ও 'ডি' যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় খাদ্যহিসাবে একেও দুধের মত একটি আদর্শ খাদ্য বলা যেতে পারে।

৭

অসার পদার্থের রেচন

খাদ্য ও পানীয়ের সার অংশটি দেহকার্যে নিয়োগের পর অসার অংশের কতকটা কি ভাবে মল ও ঘামরূপে, এবং সময় সময় নিশ্বাসের সঙ্গেও বেরিয়ে যায়, পূর্বেই তা বলা হয়েছে। অসার বস্তুগুলির যা বাকি থাকে তার মূত্রের সঙ্গে বহিষ্কার ঘটে। এই ভাবে রেচন-ক্রিয়ার জন্য বৃক্ক, গবিনী ও মূত্রাশয়ই দায়ী।

মেরুদণ্ডের দুই দিকে পেটের মধ্যে দুটি বৃক্কের অবস্থান। বৃক্ক-ধমনীর দ্বারা যে রক্ত বৃক্কে প্রবহিত হয়, তাতেই তার গ্লোমেরিউলাসের দ্বারা ছাঁকন-প্রক্রিয়ার ফলে রক্তের প্রোটিন (অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন প্রভৃতি) ব্যতীত অন্যান্য সকল উপাদানগুলি মূত্রনলীর প্রথমাংশে উপস্থিত হয়।

অতঃপর যে উপাদানগুলি দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক (যথা, গ্লুকোজ) তাহা সম্পূর্ণরূপে, এবং জলীয় ভাগ এবং লবণ প্রভৃতিও আংশিকভাবে পুনঃ শোষণ-ক্রিয়ার দ্বারা রক্তের মধ্যে ফিরে যায়। অন্যান্য ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন প্রভৃতি অসার উপাদানগুলি, এবং মূত্রনলিকায় ক্ষরিত অ্যামোনিয়া, হিপ্পিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতিও দ্রবীভূত ক্লোরাইড, ফসফেট, সালফেট প্রভৃতি লবণের সহিত প্রথমে বৃক্ক-গহ্বরে এবং তা হতে গবিনীর সাহায্যে তলপেটে মূত্রাশয়ে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে গিয়ে জমা হতে থাকে। ঐ সময় মূত্রাশয়ের পেশীর অল্প সংকোচন হতে থাকলেও শীঘ্রই তার অবসান হয় এবং যখন ৩০০-৪০০ সি সি মূত্র তাতে জমা হয়, তখনই হঠাৎ তার মধ্যে চাপবৃদ্ধির ফলে একই সঙ্গে তার পেশীময় প্রাচীরের সংকোচন ও মূত্রাশয়ের মুখের শৈথিল্য ঘটে ব'লে মূত্রের বহিষ্কার ঘটে। ঐ সময়ে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্মে, এবং ইচ্ছাক্রমে পেটের পেশীগুলির চাপও বৃদ্ধি হয় ব'লে মূত্রাশয়ের উপর চাপ দিয়ে মূত্র ত্যাগের সহায়তা করা হয়। ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে খানিকক্ষণ মূত্র ত্যাগ বন্ধ রাখা সম্ভবপর হলেও, যখন তার মধ্যে চাপ ১০০ সেন্টিমিটারের অধিক হয় তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি মূত্র স্খলন হয়ে যায়। শিশুদের মূত্রত্যাগ প্রক্রিয়ার উপর ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাবই নেই, এজন্য তারা নিজের অজ্ঞাতসারে যখন তখন মূত্র ত্যাগ ক'রে কাপড়জামা নষ্ট ক'রে বসে। ধীরে ধীরে অভ্যাসের বশে যখন ইচ্ছাশক্তির প্রভাব মূত্রাশয়ের উপর এসে পড়ে, তখন হতেই তারা ইচ্ছানুরূপ মূত্র ত্যাগ করতে পারে।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, সুষুম্নাকাণ্ড ও স্নায়ুর ক্রিয়া

এক স্থান হতে অপর স্থানে সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য প্রত্যেক সভ্য দেশে দুটি পদ্ধতি প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়, একটি সময়সাপেক্ষ —ডাক বিভাগ, অপরটি ত্বরিত—টেলিগ্রাফ বিভাগ। আমাদের দেহের মধ্যেও অনুরূপ দুটি বিভাগ আছে; রক্তপ্রবাহ ডাক বিভাগের চিঠি-পত্র পার্সেল প্রভৃতির ন্যায় পরিপুষ্টি, অক্সিজেন, অন্তঃক্ষরণ প্রভৃতি যেমন এক স্থান হতে অপর স্থানে নিয়ে যায়, আবার তেমনি অসার এবং অনিষ্ট-কর বস্তুকেও ঠিক বিপরীত দিকে ব'য়ে নিয়ে তাদের রেচনের সাহায্য ক'রে থাকে। অপর পক্ষে দেহের সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রটি টেলিগ্রাফ বিভাগের সমতুল্য; মস্তিকের বিভিন্ন অংশ ও সুষুম্নাকাণ্ড এর হেড-অফিস, দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এর শাখা-অফিস, স্নায়ুগুলি উভয়ের সংযোগকারী তার, ইন্দ্রিয়-স্থানগুলি সংবাদগ্রাহক, এবং পেশী, কণ্ডরা, গাঁট ও গ্রন্থি-গুলি আজ্ঞাবহ সক্রিয়তার বাহন। সুতরাং যে বিশেষ তন্ত্রের সাহায্যে, আমরা দেখি, শুনি, ঘ্রাণ অথবা আস্বাদ নিই, অথবা উত্তাপ, শীত, স্পর্শ, বেদনা প্রভৃতি অনুভব করি, ভাল মন্দ বিবেচনা করি, সুখ-দুঃখ টের পাই, অথবা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ইচ্ছানুসারে অথবা কখনো কখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই চালনা করি, তারই নাম স্নায়ুতন্ত্র অথবা নার্ভতন্ত্র (nervous system); এই তন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়:—

(১) মেরুমস্তিষ্ক (cerebrospinal system), এবং

(২) স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (autonomic system)

স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—

(১) কেন্দ্রীয় (central) অংশ অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক, মস্তিষ্কযোজক, মধ্যমস্তিষ্ক, সুষুম্নাশীর্ষক এবং সুষুম্নাকাণ্ড ; এবং

(২) বহিরংশ (peripheral)— অর্থাৎ অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ু (afferent and efferent nerves) এবং তাদের সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগ্রন্থি অথবা গ্যাংলিয়নসমূহ (ganglia)।

কেন্দ্রীয় অংশের প্রথম পাঁচটি ভাগ করোটির মধ্যে এবং সুষুম্না-কাণ্ডটি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকে, এবং তাদের তিনটি সুস্পষ্ট আবরণের মধ্যে যে বিশেষ তরল পদার্থ থাকে, তাই আবার মস্তিষ্কের ভিতরের পার্শ্ববর্তী দুটি এবং তৃতীয়, চতুর্থ নিলয়ের মধ্যে এবং সুষুম্নাকাণ্ড মধ্যস্থ কেন্দ্রীয় প্রণালীতেও থাকে।

গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)— মস্তিষ্কের এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা আকারে বড় এবং এর দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অংশ একে অন্যের সহিত

কর্পস কেলোসম (corpus callosum) নামক বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত। কতকগুলি গভীর খাঁজের দ্বারা গুরুমস্তিষ্কের অর্ধাংশ দুটি কতকগুলি

পিণ্ডে (lobes) এবং ঐ পিণ্ডগুলিও আবার কতকগুলি অগভীর খাঁজের (sulci) দ্বারা ছোট ছোট পিণ্ডকে (gyri) বিভক্ত হয়ে থাকে। এই সকল বিভাগের কোনটি দৃষ্টিকেন্দ্র, কোনটি শ্রুতিকেন্দ্র, কোনটি ঘ্রাণ-কেন্দ্র, কোনটি স্বাদকেন্দ্র, কোনটি সাধারণ অনুভূতির কেন্দ্র, কোনটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গচালনার কেন্দ্র, আবার কোনটি বা মনন, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের মানসিক ক্রিয়ার কেন্দ্র। এক কথায় বলতে গেলে, গুরু-মস্তিষ্কই দেহের প্রকৃত কর্তা; বাড়ির কর্তার অজ্ঞাতসারে এবং অনুমতি ব্যতীত যেমন বাড়িতে কিছুই ঘটতে পারে না, আমাদের দেহেও তেমনি গুরুমস্তিষ্কের অগোচরে এবং তার আদেশ ব্যতীত অতি অল্প ক্রিয়াই চলতে পারে। মানবেতর প্রাণীর গুরুমস্তিষ্কে এতগুলি পিণ্ডক সাধারণত থাকে না, এবং সদ্যজাত শিশুর মস্তিষ্কেও পিণ্ডকগুলি সংখ্যায় কম থাকে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন পিণ্ডকের আবির্ভাব হতে দেখা যায়। সুতরাং যার গুরুমস্তিষ্কে এইরূপ পিণ্ডকের সংখ্যা যত বেশি হয়, সে তত বেশি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল হয়, এ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। গুরুমস্তিষ্কের উপাদানের মধ্যে কতকগুলি ধূসর পিণ্ডক থাকে, তাদের মস্তিষ্কপাদস্থ গ্রন্থি (Basal ganglia) বলে এবং এদের সাহায্যে পেশীর স্বাভাবিক কুঞ্চন রক্ষা হয় এবং তার সূক্ষ্ম আন্দোলনও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

গুরুমস্তিষ্কের অবতেজনার জন্যই ঘুম আসে, আবার ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে গুরুমস্তিষ্কের প্রভাবে কতকগুলি আবস্থিক প্রতিবর্তিত (conditioned reflexes) ক্রিয়াও ঘটতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে, প্রতিদিন যে সময়ে খাই বা শুতে যাই, ঠিক সেই সময়েই ক্ষুধা ও নিদ্রার আবির্ভাব প্রত্যেকেই লক্ষ্য করে থাকেন। যদি কোন কারণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, তা হলে ঠিক সময়ে ক্ষুধার ও নিদ্রার

উদ্রেক নাও হতে পারে ; যেমন, নূতন স্থানে, অপরিচিত শয্যায় সহজে ঘুম আসতে চায় না, কিন্তু দু-তিন দিনের অভ্যাসের ফলে, পুনরায় অভ্যস্ত অবস্থা ফিরে আসে। আবার অভ্যাসের ফলে গুরুমস্তিষ্কের মধ্যে নূতন নূতন পিণ্ডকের ও কেন্দ্রের উৎপত্তির ফলে এক দিকে যেমন স্মৃতি, দৃষ্টি অথবা ঘ্রাণশক্তি প্রখর হয়, আবার অন্য দিকে কোন বিশেষ কার্যের প্রতি আসক্তি ও ক্রমে তাতে কুশলতা দেখা যায়। সুতরাং থিয়োডোর রুজভেল্টের মতে "নেপোলিয়ন অতিবিকশিত মনোবৃত্তিসম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন" এ কথাটা সর্বাংশে সত্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রত্যেক গুরুমস্তিষ্কের অভ্যন্তরে পার্শ্ববর্তী নিলয় (lateral ventricles) নামক একটি গহ্বর আছে, আবার কিঞ্চিৎ পশ্চাৎভাগে এদের সঙ্গে সংযুক্ত তৃতীয় নিলয় (third) ventricle) নামক আর একটি গহ্বর দেখা যায়, এই গহ্বরগুলির মধ্যে একটি বিশেষ তরল পদার্থ (cerebrospinal fluid) উৎপন্ন হয় এবং তারা তাতে পূর্ণ থাকে। তৃতীয় নিলয় সুষুম্নাশীর্ষকের পশ্চাতের চতুর্থ নিলয়ের (fourth ventricle) সহিত একটি সংযোজক প্রণালীর দ্বারা যুক্ত থাকে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের আভ্যন্তরিক কেন্দ্রীয় প্রণালীটি (central canal of the spinal cord) চতুর্থ নিলয়ের সহিত যুক্ত ব'লে এই তরল পদার্থটি এক গহ্বর হতে অপর গহ্বরে এই প্রণালীতে প্রবাহিত হতে থাকে। আবার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও সুষুম্নাকাণ্ডের বাইরে যে তিনটি আবরণ (membranes) থাকে, তার মধ্যাবরণের নিম্নে অথবা তদ্‌ঘটিত আধারের (cisternœ) সহিত কতকগুলি ছিদ্রপথে (foramina) আভ্যন্তরিক গহ্বরগুলির যোগাযোগ থাকাতে মস্তিষ্কের ও সুষুম্নাকাণ্ডের বাইরেও এই তরল পদার্থটি সঞ্চালিত হতে থাকে। এই ভাবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশগুলি আভ্যন্তরিক রক্তের চাপ বৃদ্ধি

অথবা বাইরের আঘাত হতে রক্ষিত হয়। আবার রক্ত হতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন প্রভৃতি পরিপুষ্টির এবং তাদের মধ্যস্থ নানা দূষিত পদার্থের রক্তে বহনের মধ্যপন্থী সামগ্রীরূপেও কার্য করে।

থ্যালামস ও অধস্থ্যালামস (Thalamus & hypothalamus)—তৃতীয় নিলয়ের ভিতরের দিকে ধূসর রঙের যে বড় অংশটি দেখা যায় তাকে থ্যালামস কহে, আবার ইহার ঠিক নীচেই তৃতীয় নিলয়ের প্রাচীরের মধ্যে অধস্থ্যালামস নামক অংশ থাকে। দেহের আদিম সংবেদীয় কেন্দ্ররূপে থ্যালামস আমাদের যে কোন তীব্র অনুভূতি (অতি শীত, অতি গ্রীষ্ম, অতি বেদনা প্রভৃতি) এবং গাঁটগুলির তীব্র ও অস্বাভাবিক আন্দোলন সম্বন্ধে চেতনা উৎপন্ন করে, কিন্তু পার্থক্যবোধক নাতি অনুভূতির কেন্দ্র গুরুমস্তিষ্কে অবস্থিত। এর সাহায্যে একদিকে যেমন ব্যথা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির স্বরূপ জানা যায়, আবার তেমনি ক্রোধ, অনুরাগ, লজ্জা প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনাজনিত প্রতিবর্তিত ক্রিয়াগুলিও থ্যালামসের দ্বারাই সাধিত হয়।

আত্মরক্ষা অথবা জীবন ধারণের জন্য আক্রমণাত্মক পরাসমব্যথী বা সমব্যথী স্নায়ুর (parasympathetic and sympathetic nerves) ক্রিয়া এবং ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক চাঞ্চল্যকর ছদ্ম অবস্থা অধস্থ্যালামসের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। পিটুইটারি গ্রন্থির (Pituitary gland) মূত্র-প্রতিরোধক ও জরায়ু-সংকোচক উত্তেজক উপাদানগুলির ক্ষরণের দ্বারা দেহের জলীয় ভাগ, স্নেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদানের বিপাক (metabolism) প্রক্রিয়াও এই অংশের সাহায্যে ঘটে। অধিকন্তু নিদ্রা এবং দেহের তাপ-সংরক্ষণের সহিতও অধস্থ্যালামস ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

মধ্যমস্তিষ্ক (Mid-brain)—মস্তিষ্কে যে সরু ছোট অংশ একদিকে

গুরুমস্তিষ্ক ও থ্যালামস এবং অপর দিকে মস্তিষ্কযোজক ও লঘুমস্তিষ্কের সংযোগ ঘটায়, তাকেই মধ্যমস্তিষ্ক কহে। এর পশ্চাৎভাগে চারটি ঢিবি আছে ব'লে তাকে পিণ্ড-চতুষ্টয় (corpora quadrigemina) বলে। উপরের এই দুটি পিণ্ড নিম্নদৃষ্টিকেন্দ্র নামে পরিচিত, কেননা সহসা চোখে তীব্র আলোকপাতে, চোখের তারা যে ছোট হয়ে যায় অথবা চোখের পাতা আপনি বুজে আসে, এ সকল ক্রিয়া এদের দ্বারাই ঘ'টে থাকে। এইরূপে নিম্ন পিণ্ড দুটি শ্রুতিবহ তন্তুগুলির বিরতিস্থানরূপে নিম্নশ্রুতিকেন্দ্র নামে অভিহিত হয়।

এই অংশের মধ্যে লোহিত নিউক্লিয়স (red nucleus) ও কৃষ্ণোপাদান (substantia nigra) নামক দুটি সুস্পষ্ট অংশ আছে। খুব সম্ভবত প্রথমটির দ্বারা পেশীর কতকগুলি বিশিষ্ট সঞ্চালনক্রিয়া সাধিত হয়, কারণ গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিক প্রভৃতি হতে আগত উত্তেজনা-প্রবাহের, চেষ্টীয় মেরু অথবা করোটিসংলগ্ন স্নায়ুর কেন্দ্রে গিয়ে পৌছবার আগে এখানেই তাদের আবশ্যকমত পরিবর্তন ঘটে। কৃষ্ণোপাদান নামক অংশও একইভাবে নৃত্য, ব্যায়াম প্রভৃতিতে যে সকল নিপুণ অঙ্গসঞ্চালন আবশ্যক, তাদের জন্য উপযুক্ত বহিরাগত উত্তেজনাকে একত্রীকৃত ক'রে থাকে ; এইজন্য নর এবং বানর দেহে এই অংশের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

মস্তিষ্কযোজক (Pons)—মধ্যমস্তিষ্কের সঙ্গে সুষুম্নাশীর্ষক ও লঘু-মস্তিষ্কের সংযোগকারী অংশকে মস্তিষ্কযোজক বলে। শ্বসনক্রিয়ার সময় এই অংশের দ্বারা নাসিকা, গলবিল, বাগ্‌যন্ত্র প্রভৃতির এবং বাক্‌স্ফুরণকালে বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াও নিয়ন্ত্রিত হয়। আহারের সময় মুখের ও গলাধঃকরণের পেশীগুলির ক্রিয়া এবং কারো মতে চক্ষু, কর্ণ ও গ্রীবার উপযুক্ত সংস্থানও এই অংশের সাহায্যে নিমন্ত্রিত হয়। তা ছাড়া নাসিকা, নেত্রবর্ত্মকলা

(conjunctiva), পিচুটি-গ্রন্থি (lachrymal glands) এবং নিম্নচোয়াল-সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিবর্তিত ক্রিয়াও এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum)—মস্তিষ্কযোজক ও সুষুম্নাশীর্ষকের পশ্চাতে চতুর্থ নিলয় আছে, তারই পশ্চাতে লঘুমস্তিষ্কটি থাকে এবং তাদের সঙ্গে যেমন মধ্য ও নিম্ন বৃন্তের দ্বারা এর সংযোগ আছে, তেমনি মধ্যমস্তিষ্কের সঙ্গেও সর্বোচ্চ বৃন্তের দ্বারা এর যোগাযোগ সাধিত হয়। অঙ্গবিন্যাসের জন্য আবশ্যক প্রতিবর্তিত ক্রিয়ার এটাই প্রধান কেন্দ্র। এই দিকের পেশী কণ্ডরা, অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী এবং অপর দিকের অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী প্রভৃতি হতে অসংজ্ঞ অনুভূতি-গুলি যখন এসে লঘুমস্তিষ্কে পৌঁছয়, তখন ঐ সকল প্রবাহ তিনটি সংযোজক বৃন্তের দ্বারা যথাক্রমে গুরুমস্তিষ্ক, মস্তিষ্কযোজক ও সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, স্থিতিশীল অথবা গতিশীল অবস্থায় যেমনটি আবশ্যক ঠিক তেমনটি দেহের সমগ্র পেশীর ক্রিয়া ঘটে থাকে। সুতরাং অনেকগুলি পেশীর ক্রিয়ার সমন্বয়ে যে সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তার এবং পেশীর স্বাভাবিক সংকোচন রক্ষার জন্যও এই অংশটি দায়ী।

সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla oblongata)—সুষুম্নাকাণ্ডের উপরি-ভাগে, মস্তিষ্কযোজকের নিম্নেই এই অংশটি অবস্থিত। এই স্থানটি বড়ই সাংঘাতিক, কারণ এই স্থানে কোনরূপে আঘাত লাগলে সংজ্ঞা লোপ হয় এবং সময় সময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, ধমনী-সংকোচন, গলাধঃকরণ, লালানিঃসরণ, বমন প্রভৃতির কেন্দ্র মস্তিষ্কের এই অংশে আছে। বিজ্ঞানী ক্লাডবার্নাড-এর মতে যকৃতে শর্করা হতে গ্লাইকোজেনের রূপান্তরের কেন্দ্রের অবস্থানও মস্তিষ্কের এই অংশে। ব্যাঙ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর এই অংশই মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা প্রধান অংশ,

কিন্তু অভিব্যক্তির ফলে উচ্চতর প্রাণীদের কেবল জীবনধারণের অত্যাবশ্যক কেন্দ্রগুলিই এই অংশে থাকে, এই উচ্চবৃত্তিমূলক কেন্দ্রগুলি ক্রমশ উপরে গিয়ে গুরুমস্তিষ্কে স্থান লাভ করে।
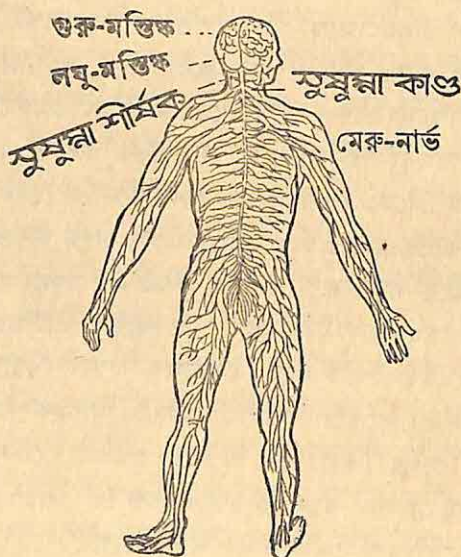
সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord)—মেরুদণ্ডমধ্যস্থ নলাকার প্রণালীতে ইহা একটি রজ্জুর আকারে বস্তিপ্রদেশ পর্যন্ত নেমে গিয়ে, অবশেষে অতি সরু লাঙ্গুলান্তে (filum terminale) শেষ হয়েছে; এটি প্রায় ষোল ইঞ্চি লম্বা এবং একটি আঙুলের মত মোটা। মাথার নীচে শরীরের সকল অংশ হতে স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ প্রভৃতি সংবেদীয় অনুভূতি, পেশী-কণ্ডরা, অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী হতে অঙ্গবিন্যাসসংশ্লিষ্ট অসংজ্ঞ পেশীর অনুভূতির কেন্দ্রাংশে বহন, চেষ্টীয় কেন্দ্রকোষের দ্বারা পেশীর সংকোচন এবং চেষ্টীয় তন্তুর উপরকার অংশের দ্বারা এদের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণক্রিয়া

প্রভৃতি সুষুম্নাকাণ্ডের দ্বারা সাধিত হয়। সহযোগী শ্বসনকেন্দ্র ও নিম্ন ধমনী সংকোচক কেন্দ্র এতে থাকাতে সময় সময় শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্ত-চলাচলের নিয়ন্ত্রণও এর দ্বারা হতে পারে। সমব্যথী স্নায়ুর উৎপত্তিস্থল ব'লে তারারন্ধ্রের বিস্ফারণ, লালার ক্ষরণ, হৃৎস্পন্দনের গতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিকোচন, রক্তপ্রণালীর সংকোচন, অ্যাড্রিনেলিনের ক্ষরণ প্রভৃতিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এতদ্ব্যতীত মল ও মূত্র ত্যাগ, সন্তানপ্রসব এবং হাঁটুর ঝাঁকানি (knee-jerk) প্রভৃতির কেন্দ্রও সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্নভাগে অবস্থিত।

শাখাস্নায়ু

এইগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :—(১) করোটি স্নায়ু ও (২) মেরু স্নায়ু। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হতে বারো জোড়া এরূপ স্নায়ু উৎপন্ন হয়, এই করোটির বিভিন্ন ছিদ্রপথে নাসিকা, চক্ষু, মুখমণ্ডল, কান, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র, জিহ্বা প্রভৃতিতে গিয়ে শেষ হয়। নিম্নে তাদের নাম, উৎপত্তি ও ক্রিয়া দেওয়া গেল :

(১) ঘ্রাণবহ স্নায়ু (olfactory nerve)— নাসিকার অভ্যন্তরে ঘ্রাণেন্দ্রিয় হতে উৎপন্ন হয়ে ঘ্রাণ-অনুভূতিকে ঘ্রাণকেন্দ্র হাইপো-ক্যাম্পাসএ নিয়ে যায়।

(২) দৃষ্টিবহ স্নায়ু—(optive nerve)—অক্ষিপট হতে আরম্ভ হয়ে আংশিকভাবে অপর স্নায়ুটিকে অতিক্রম ক'রে গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাৎ পিণ্ডে অবস্থিত দৃষ্টিকেন্দ্রে, দৃষ্টি-অনুভূতি বহন করে।

(৩) অক্ষিগোলকের পেশীসমূহের চেষ্টীয় স্নায়ু (occulomotor nerve)—এর উৎপত্তিকেন্দ্রটি মধ্যমস্তিষ্কে তৃতীয় ও চতুর্থ নিলয়ের

সংযোজক প্রণালীকে ঘিরে থাকে। উপরে, নীচে এবং নাকের দিকে চোখ ঘুরোতে হলে এই স্নায়ুর ক্রিয়া আবশ্যক। তা ছাড়া এর সাহায্যে চোখের উপরের পাতাও উঠনো যায় এবং চোখের তারাও তীব্র আলোকে ছোট হয়ে থাকে।

(৪) অক্ষিগোলকের উর্ধ্ববক্রগ পেশীর স্নায়ু (trochlear nerve)—এর সাহায্যে চোখকে ব্যগ্রভাবে নীচের দিকে ঘুরনো যায়।

(৫) মুখমণ্ডলের সংবেদীয় ত্রিশাখ স্নায়ু (trigeminal nerve)—সমগ্র মুখমণ্ডলের সাধারণ অনুভূতিগুলি অর্ধচন্দ্রাকার স্নায়ুগ্রন্থিতে নিয়ে যায়। এর যে ক'টি চেষ্টীয় তন্তু আছে, তারা মধ্যমস্তিষ্কে উৎপন্ন হয়।

(৬) অক্ষিগোলকের বহিঃপার্শ্বস্থ পেশীর স্নায়ু (abducent nerve)—এর কেন্দ্রটি মধ্যমস্তিষ্কে তৃতীয় স্নায়ুর কেন্দ্র ও লোহিত নিউক্লিয়সের মাঝামাঝি অবস্থিত, এবং এর দ্বারা এক চোখকে বাহিরের দিকে এবং একই সঙ্গে অপর চোখকে নাকের দিকে ঘুরনো সম্ভবপর।

(৭) মৌখিক স্নায়ু (facial nerve)—চতুর্থ নিলয়ের ভূমিতে ষষ্ঠ স্নায়ুকেন্দ্রের উভয় দিকের কেন্দ্র হতে উৎপন্ন হয় এবং সংবেদীয় কতকগুলি তন্তুও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এর দ্বারা মুখের সকল পেশীর ক্রিয়া চলে, এবং একটি বিশিষ্ট সংবেদীয় শাখার দ্বারা জিভের সম্মুখের তিনভাগের দু-ভাগ হতে স্বাদ-অনুভূতি লাভ হয়।

(৮) শ্রুতিবহ স্নায়ু (auditory nerve)—শ্রবণেন্দ্রিয় হতে উৎপন্ন হয়ে অপর স্নায়ুকে আংশিকভাবে ব্যতিক্রম ক'রে মস্তিষ্কের রগস্থানীয় পিণ্ডে (temporal lobe) শ্রুতিকেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়ে থাকে। এর সাহায্যে শ্রুতি-প্রবাহ বাহিত হয়।

(৯) জিহ্বামূলীয় স্নায়ু (glossopharyngeal nerve)—এর উৎপত্তিকেন্দ্র সুষুম্নাশীর্ষকে অবস্থিত। এর সাহায্যে গলবিলের পেশীগুলির

সংকোচন হয় এবং সংবেদীয় তন্তুগুলি জিভের পশ্চাৎ তৃতীয়াংশ হতে স্বাদ অনুভূতি, অঙ্কুশাকৃতি পিণ্ডকে (uncus) বয়ে নিয়ে যায়।

(১০) ভেগস স্নায়ু (vagus nerve)—নবম ও একাদশ স্নায়ুর সঙ্গে একই কেন্দ্র হতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সংবেদীয় তন্তুগুলি এর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিগুলিতেই থাকে। এই সকল পরাসমব্যথী তন্তু হৃৎস্পন্দন হ্রাস, পাচকাম্লরস ও অগ্ন্যাশয়রসের ক্ষরণ, পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংকোচন প্রভৃতি ঘটায়, এবং সংবেদীয় তন্তুগুলি প্রধানত শ্বসনক্রিয়া সম্বন্ধীয় অনুভূতি শ্বাসকেন্দ্রে বয়ে নিয়ে যায়।

(১১) মেরুস্নায়ুর সহায়ক স্নায়ু (spinal accessory nerve)—আংশিকভাবে সুষুম্নাশীর্ষকে এবং আংশিকভাবে সুষুম্নাকাণ্ডে থাকে। এর দ্বারা স্টার্নোমেস্টয়েড ও ট্রাপিজিয়স নামক দুটি পেশীর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

(১২) রসনা-নিম্নবর্তী স্নায়ু (hypoglossal nerve)— সুষুম্না-শীর্ষকের মধ্যসীমারেখার নিকটবর্তী কেন্দ্রে উৎপন্ন হয়ে এই স্নায়ু জিভের পেশীগুলির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে।

মেরু স্নায়ু (Spinal nerves)-গাছের কাণ্ড হতে যেমন ডালপালা গজায়, তেমনি সুষুম্নাকাণ্ডের উভয় দিক হতে ৩১ জোড়া স্নায়ু বের হয়ে হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে এবং পেটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

কার্যহিসাবে শাখা স্নায়ুগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, (১) সংবেদীয় স্নায়ু, ও (২) চেষ্টীয় স্নায়ু।

সংবেদীয় স্নায়ু (Sensory nerves)—এদের সাহায্যে নানারূপ অনুভূতি লাভ হয়। দেহের ত্বকে স্পর্শ, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতিবোধক যে সকল সাধারণ ইন্দ্রিয়স্থান আছে, অথবা চোখ, কান, নাক, জিভ

প্রভৃতি যে চারপ্রকার বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে, তা হতে বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি যখন স্নায়ুগুলি মস্তিকের বিভিন্ন অনুভূতিকেন্দ্রে বয়ে নিয়ে যায়, তখনই আমরা ওই অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হই। কোনও সংবেদীয় স্নায়ু নষ্ট হয়ে গেলে, তৎসংশ্লিষ্ট অনুভূতি আর থাকে না।

চেষ্টীয় স্নায়ু (Motor nerves)—মস্তিষ্কের আদেশক্রমে অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যে সকল বহির্মুখ স্নায়ু অঙ্গ, প্রতঙ্গ, পেশী অথবা গ্রন্থিকে স্ব-স্ব কার্যে উদ্বুদ্ধ করে, তাদেরই নাম চেষ্টীয় স্নায়ু।

প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়া (Reflex action)

পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতি কোনও বহিষ্কলা হতে উৎপন্ন অন্তর্মুখ উত্তেজনা-প্রবাহের বহির্মুখ স্নায়ুর সাহায্যে পুনরায় স্বস্থানে ফিরে এসে, যখন সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিকভাবে এদের সংকোচন অথবা ক্ষরণ ঘটায়, তখন এরূপ ক্রিয়াকে প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়া বলে। এর জন্য সাধারণত (১) একটি গ্রাহক ইন্দ্রিয়, (২) তৎসংশ্লিষ্ট একটি অন্তর্মুখ স্নায়ু, (৩) কেন্দ্র-সংলগ্ন একটি বহির্মুখ স্নায়ু, এবং (৪) প্রতিক্রিয় বহিস্থ দেহাংশ, যথা—পেশী, গাঁট, কণ্ডরা গ্রন্থি প্রভৃতি আবশ্যক। তীব্র আলোকপাতে চক্ষুতারকার সংকোচন খাদ্যগ্রহণে মুখে লালার এবং পাকস্থলীতে পাচকাম্লরসের ক্ষরণ, মূত্রাশয়ে অনেকক্ষণ মূত্র জমা হতে থাকলে, মূত্রত্যাগের জন্য এর পেশীর সংকোচন এবং তৎসঙ্গে এর মুখের বিকোচন প্রভৃতি দেহের অসংখ্য ক্রিয়া এরূপ প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৯

স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র

(Autonomic nervous system)

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের প্রভাবের বাইরে স্নায়ুতন্ত্রের একটা পৃথক বিশিষ্ট অংশ আছে, তাকেই স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র বলে। গঠন, প্রকৃতি এবং নানা ঔষধের সুস্পষ্ট ক্রিয়া অনুসারে ইহারও দুটি শ্রেণী আছে, যথা—(১) পরাসমব্যথী অথবা মধ্যমস্তিষ্ক, সুষুম্নাশীর্ষক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের ত্রৈকাস্থিক অংশ, এবং (২) সমব্যথী অথবা বক্ষ ও কটি দেশীয় অংশ। এদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি স্নায়ুগ্রন্থি অথবা গ্যাংগ্লিয়ন, এবং বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ স্নায়ু আছে। চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র, যকৃত, প্লীহা, বৃক্ক, মূত্রাশয় প্রভৃতি দেহযন্ত্রগুলি স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের দুই প্রকার স্নায়ুরই প্রভাবে সর্বদা কার্য করে। কোনওপ্রকার আকস্মিক উত্তেজনার কারণ ঘটলে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবিধান করাই এই স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সমব্যথী স্নায়ু সর্বদাই অপরকে আক্রমণ ক'রে শক্তির অপব্যয়ে দেহরক্ষার চেষ্টা করে, কিন্তু পরাসমব্যথী অংশ বিপরীত ভাবে অযথা শক্তির অপচয় বন্ধ ক'রে অথবা দেহক্ষয়ের পরিপূরণের দ্বারা দেহকে অপরের আক্রমণ হতে বাঁচাতে চায়। তা ছাড়া স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশের জলীয় ভাগের সাম্য রক্ষিত হয়, এবং ত্রৈকাস্থিক পরাসমব্যথী তন্তুগুলি মল ও মূত্র ত্যাগ এবং সন্তানপ্রসবক্রিয়ারও সাহায্য করে থাকে। পরাসমব্যথী তন্তুর উত্তেজনাকালে ওই সকল স্নায়ুপ্রান্তে এসেটিল কোলিন নামে এবং সমব্যথী তন্তুর প্রান্তে উত্তেজনার ফলে সিম্পেথিন নামক অ্যাড্রিনেলিনের

ন্যায় ক্রিয়াবিশিষ্ট যে উপাদান উৎপন্ন হয়, তাই রক্তের সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অংশে বের হয়ে একসঙ্গে দেহের অনেকগুলি যন্ত্রকে সক্রিয় করে থাকে।

সাধারণত এই স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়ার উপর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোনও প্রভাব না দেখা গেলেও, অধুনা স্থির হয়েছে যে হৃৎস্পন্দন, ধমনীর সংকোচন, গলাধঃকরণ, বমন, অ্যাড্রিনেলিন অথবা ইনস্থলিনের অন্তঃক্ষরণ প্রভৃতি যে সকল বিশিষ্ট ক্রিয়ার নিজস্ব স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র মস্তিকের কোন না কোন অংশে আছে, অধস্থ্যালামসের উপর উত্তেজনা প্রয়োগে ওই সকল ক্রিয়ার কতকটা পরিবর্তন ঘটে ; সুতরাং মনে হয় যে, মস্তিষ্কের এই অংশের স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়ার উপর বিশিষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। গুরুমস্তিকের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিও কতকটা অধস্থ্যালামসের সাহায্যে এবং কতকটা অতিরিক্ত পিরামিড গুচ্ছের সাহায্যে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের উপর নিজ প্রভাব আরোপ ক'রে থাকে।

১০

ইন্দ্রিয়স্থানসমূহ

দেহের ত্বক, আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়স্থান। এতে যে সকল স্পর্শ, উত্তাপ ও ব্যথার স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়কণাগুলি আছে, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া চারটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদন—এই চারপ্রকার জ্ঞান লাভ করি।

(১) দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু

নাকের উপরের অংশের দুই দিকে, দুটি গহ্বরের মধ্যে চারধারে অনেকগুলি পেশীসমন্বিত দুটি নেত্র-গোলক অবস্থিত। নেত্র-গোলকের

সম্মুখভাগ সে সূক্ষ্ম ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত, ঠিক তারই পশ্চাতে যে পাতলা পর্দা থাকে, তার নাম শ্বেতমণ্ডল (sclera) ; তার স্বচ্ছ কেন্দ্রীয় অংশকে অচ্ছোদপটল (cornea) বলে। এর মধ্য দিয়ে কালো রঙের ছিদ্রযুক্ত পেশীময় যে গোল পর্দা দেখা যায় তার নাম কনীনিকা (iris) এবং কেন্দ্রস্থ ছিদ্রটিই চোখের তারারন্ধ্র (pupil)। কনীনিকার চক্রাকার পেশীর সংকোচনে, অথবা ব্যাসাকার পেশীর বিকোচনে তারারন্ধ্র যেমন ছোট হয়, আবার তেমনি প্রথমটির বিকোচনে এবং দ্বিতীয় পেশীটির সংকোচনে বড় হয়ে থাকে। এইভাবে প্রয়োজনানুসারে চোখের মধ্যে অল্প বা অধিক আলোক প্রবেশ করে।
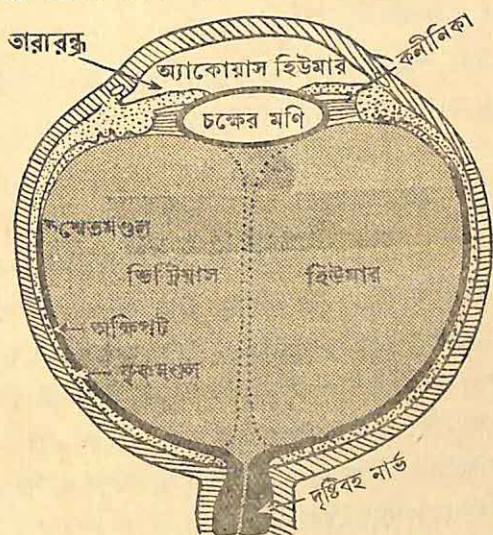
তারারন্ধ্রের পশ্চাতে স্বচ্ছ গোলাকার এবং উত্তল (convex) চোখের মণি (lens) অবস্থিত। মণির সম্মুখের আধারে একপ্রকার জলের মত তরল পদার্থ (aqueous humour) এবং মণির পশ্চাতে

অপর একটি বড় আধারে ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায় গাঢ় আর একপ্রকার তরল উপাদান (vitreous humour) থাকে। সর্বপশ্চাতে অক্ষিপট (retina) নামক কালো রঙের যে পর্দাটি আছে, তাই দৃষ্টির ইন্দ্রিয়স্থান। প্রত্যেক অক্ষিপট হতে অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্তুগঠিত যে স্নায়ুটি অক্ষিগোলকের পশ্চাৎভাগ হতে বের হয়ে মস্তিষ্কের পশ্চাৎপিণ্ডে দৃষ্টিকেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়, তারই নাম দৃষ্টিবহ স্নায়ু।

আমাদের চোখের গঠন ঠিক একটি ক্যামেরাযন্ত্রের মত। চোখের কৃষ্ণমণ্ডল ক্যামেরার কালো বাক্সের, কনীনিকা ক্যামেরার মধ্যচ্ছদার, তারারন্ধ্র ক্যামেরার আলোকপ্রবেশের ছিদ্রের, চোখের মণি ক্যামেরার লেন্সের এবং অক্ষিপট ফোটোগ্রাফের প্লেটের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এইজন্য অক্ষিপটের উপর বাহিরের বস্তুর যে প্রতিবিম্ব পড়ে তা উল্‌টাভাবেই পড়ে; কিন্তু তা ব'লে আমরা তাকে উল্‌টা দেখি না, দৃষ্টিকেন্দ্রের সাহায্যে তাকে সোজাই দেখতে পাই।

(২) শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ

এর মধ্যে তিনটি অংশ আছে—বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।

কানের বাইরের অংশ এবং ছিদ্রমুখ হতে গহ্বরের মধ্যে কর্ণপটহ পর্যন্ত বহিঃকর্ণ; এই অংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থি হতে চটচটে লালচে একপ্রকার বস্তু ক্ষরিত হয়ে এই অংশকে মসৃণ রাখে এবং একপ্রকার তিক্ত বিষের দ্বারা পোকামাকড় প্রভৃতিকে নষ্ট ক'রে কর্ণপটহকে রক্ষা করে; তারই নাম কানের খৈল।

মধ্যকর্ণ কর্ণপটহ হতে আরম্ভ হয়ে অন্তঃকর্ণের সীমারেখায় শেষ হয়েছে। এর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন তিনটি ছোট অস্থি আছে। বায়ুতে যে সকল শব্দতরঙ্গ ওঠে তাতে কর্ণপটহের (tympanic

membrane) যে কম্পন দেখা যায়, তাই এইগুলির দ্বারা অন্তঃকর্ণে বাহিত হয়। ইউস্টেকিয়ান নালী (Eustachian tube) নামক একটি
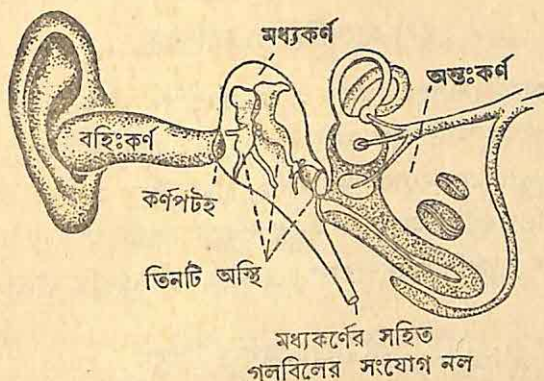
সরু নলের দ্বারা মধ্যকর্ণের সঙ্গে গলবিলের সংযোগ আছে, এজন্য সর্দি কাশি হলে অনেক সময় কানে কম শুনতে পাওয়া যায়।

অন্তঃকর্ণের মধ্যে কক্‌লিয়া (cochlea) নামক শ্রবণেন্দ্রিয়, অর্ধচন্দ্রাকারে তিনটি প্রণালী (semicircular canals) ও ভেস্টিবিউল (vestibule)নামক একটি থলের মতন প্রকোষ্ঠ আছে। শ্রবণেন্দ্রিয়টির প্রধান অংশ শামুকের খোলার মত পাকানো একটি জটিল যন্ত্র ; অসংখ্য শ্রুতিবহ স্নায়ুতন্তু এখান থেকে মস্তিষ্কের শ্রুতিকেন্দ্র (রগস্থানীয় পিণ্ড) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। শব্দতরঙ্গে কর্ণপটহের কম্পন, মধ্যকর্ণের অস্থিগুলির সাহায্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থ তরল পদার্থে পৌঁছলে, শ্রুতিবহ স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয় ও আমাদের শ্রুতি-বোধ ঘটে। অর্ধচন্দ্রাকারে অস্থিময় প্রণালী ও ভেস্টিবিউলের অভ্যন্তরে, অন্তরস ও বহিঃরস (endo and perilymph) নামক দুই প্রকার তরল পদার্থ থাকে। অন্তঃকর্ণের এই সকল যন্ত্র গতিশীল অথবা স্থিতিশীল অবস্থায় যথোচিত

ভারসাম্য রক্ষা ও অঙ্গ-বিন্যাসের (posture and equilibrium) জন্য অত্যাবশ্যক।

(৩) ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকা

নাসিকার অভ্যন্তরে ঝিল্লীর মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় থাকে। যে কোন গন্ধবিশিষ্ট বস্তুর অতি সূক্ষ্ম কণিকাগুলি বায়ুপ্রবাহে নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করলে সেখানকার ঝিল্লীমধ্যস্থ গ্রন্থির রসে দ্রবীভূত অবস্থায় যখন ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট স্নায়ুপ্রান্তে লাগে তখনই ঘ্রাণবহ স্নায়ু ঐ বিশেষ উত্তেজনাকে অঙ্কুশপিণ্ডে ঘ্রাণকেন্দ্রে বয়ে নিয়ে ঘ্রাণ-অনুভূতি ঘটায়।

(৪) স্বাদেন্দ্রিয় অথবা জিহ্বা

জিহ্বা কতকগুলি পেশী, ও তদুপরি ঝিল্লীর আবরণে গঠিত। স্বাদেন্দ্রিয়গুলি জিহ্বার উপরিভাগে এই ঝিল্লীর মধ্যে অবস্থিত, এদের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট স্বাদকোরকও (tastebuds) দেখা যায়। এই কোরক-সংশ্লিষ্ট স্নায়ুতন্তুগুলি কোন সুস্বাদু অথবা বিস্বাদু দ্রব্য লালায় দ্রবীভূত হলে, স্বাদ-অনুভূতিকে হিলোকাম্প্যাস পিণ্ডে স্বাদকেন্দ্রে বহন ক'রে স্বাদবোধ ঘটায়। জিভের বিভিন্ন অংশে পৃথক পৃথক স্বাদ অনুভূত হয়। দুই পাশের কোরকগুলি দ্বারা টক, পশ্চাতের কোরকের দ্বারা তিক্ত, কটু কষায় অগ্রভাগের দ্বারা মিষ্ট, এবং সমগ্র উপরিভাগে নোনতা আস্বাদ পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কে ঘ্রাণকেন্দ্র ও আস্বাদকেন্দ্র একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অতি নিকটে অবস্থানের জন্য, সর্দিকাশি প্রভৃতিতে যেমন কোন বস্তুর গন্ধ পাওয়া যায় না, তেমনি মুখেও তার ঠিক মত আস্বাদ পাওয়া সম্ভবপর নয়।

১১

কতকগুলি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি ও তাদের ক্রিয়া

কি ভাবে লালাগ্রন্থি হতে লালারসের এবং অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি হতে এর রসের ক্ষরণ হয়ে খাদ্যের উপযুক্ত পরিপাকের জন্য, ঐ গ্রন্থিগুলির নিজ নিজ প্রণালীর দ্বারা মুখের মধ্যে ও অন্ত্রে প্রবেশ করে, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এইভাবে, যকৃত, স্তন, পিচুটিগ্রন্থি প্রভৃতি অন্যান্য প্রণালীযুক্ত গ্রন্থির রসও বাইরে বাহিত হয় ব'লে ঐ প্রকার ক্ষরণকে বহিঃক্ষরণ বলে। আমাদের দেহে আর এক প্রকারের গ্রন্থি আছে, সাধারণত তাদের কোন ক্ষরণবাহী প্রণালী থাকে না, এবং তাদের ক্ষরিত রস সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশে, দেহের অন্যান্য অংশে গিয়ে সক্রিয়তা ঘটিয়ে থাকে। এইরূপ ক্ষরণকে অন্তঃক্ষরণ বলে। এই শেষোক্ত গ্রন্থিগুলির মধ্যে থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি, প্যারাথাইরয়েড বা উপগলগ্রন্থি, পিটুইটারী বা অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থি, অ্যাড্রিনেল বা কটিগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়ের দ্বৈপিক অংশ, এবং যৌনগ্রন্থিগুলিই প্রধান।

গলগ্রন্থি (Thyroid glands)—গ্রীবাদেশে শ্বাসপ্রণালীর সম্মুখ ভাগে, এর দুটি অংশ একটি সংকীর্ণ যোজকের দ্বারা যুক্ত। দেহের বৃদ্ধি ও বিপাক প্রক্রিয়ার উপর এর অপরিসীম প্রভাব; কারণ হাপর যেমন আগুনকে উসকে দেয়, এই গ্রন্থিটিও তেমনি বিপাক-প্রক্রিয়াকে বর্ধিত করে। এর অন্তঃক্ষরণের আয়োডিন-ঘটিত থাইরোক্সিন (Thyroxin) নামক বিশেষ উপাদানই এর জন্য দায়ী। শিশুকালে এই গ্রন্থির ক্ষরণ কম হলে ক্রেটিনিজ্‌ম (cretinism) নামক যে বিশিষ্ট বামনত্ব দেখা যায়, তাতে শরীরের চামড়া পুরু হয়, জিভ বেশ বড় হয়ে সর্বদাই

বেরিয়ে থাকে, আঙুলগুলি বেঁটে ও মোটা এবং বিরলকেশ হয়। মুখে হাবার ভাব ফুটে ওঠে, যেখানে সেখানে শরীরে চর্বি জমা হয় এবং বুদ্ধি-বিকাশ কিংবা বয়সের সঙ্গে যৌবনের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। পরিণত বয়সে এরূপ কম ক্ষরণ হতে থাকলে 'মিক্সিডিমা' (myxœedema) নামক শোথরোগ দেখা যায়, তাতে চামড়ার নীচে একপ্রকার স্নেহ জাতীয় বস্তু সঞ্চিত হয়, চোখ-মুখ ফুলে উঠে চুল প'ড়ে যায়, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ, বুদ্ধিমত্তার অভাব, এবং সর্বদেহে আলস্যের লক্ষণসমূহ ফুটে ওঠে।

আবার এই গ্রন্থির অধিক ক্ষরণ হতে থাকলে ছানাবড়া চোখ ও গলগণ্ড (exophthalmic goitre) একসঙ্গে দেখা যায়। এর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনসংখ্যা বৃদ্ধি ও হাত পায়ের সূক্ষ্ম কম্পন, রুগ্নদেহে তাপ-বৃদ্ধি এবং বহুমূত্র প্রভৃতিও ঘটে।

উপগলগ্রন্থি (parathyroid glands)—এরূপ সংখ্যায় চারটি গ্রন্থি প্রায়শ গলগ্রন্থির উপাদানের মধ্যে প্রোথিত থাকে। এদের অন্তঃক্ষরণের প্রভাবে রক্তে ক্যালসিয়মের স্বাভাবিক পরিমাণ ঠিক থাকে ; কেননা, কোন কারণে এর অল্পতা ঘটলে, হাত হতে ক্যালসিয়ম ও ফসফরস প্রয়োজনমত বেরিয়ে এসে রক্তের অভাব পূরণ করে। আবার ভাইটামিন 'ডি' অথবা সূর্যালোকের সহযোগে এই অন্তঃক্ষরণ বর্ধনশীল অস্থিতে প্রয়োজনানুরূপ ক্যালসিয়মের বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে।

কোনও কারণে এই অন্তঃক্ষরণের পরিমাণ কমে গেলে টিটানি (tetany) নামক এক প্রকার রোগ জন্মে। এতে রক্তে স্নায়ুর স্নিগ্ধকর উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়মের অভাবে বহিঃস্নায়ুগুলি অতিশয় উত্তেজনাপ্রবণ হয়, পেশীগুলিতে প্রথমে সূক্ষ্ম ও পরে স্থূল অনিয়মিত সংকোচনের ফলে হাত পায়ের অস্বাভাবিক কাঠিন্য দেখা যায়, এবং

খাদ্যনালীর ও পাকস্থলীর সংযোগস্থলে অনবরত সংকোচন হতে থাকে।

অধোমস্তিষ্কগ্রন্থি (Pituitary gland)—মস্তিষ্কের নীচে একটি অতি সুরক্ষিত অস্থির প্রকোষ্ঠে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। এই প্রকার যতগুলি গ্রন্থি আছে তার মধ্যে এটিই সর্বপ্রধান। দেহবৃদ্ধি, দুগ্ধক্ষরণ, স্নেহসংক্রান্ত বিপাক ক্রিয়া এবং স্বাভাবিকভাবে গলগ্রন্থি, কটিগ্রন্থি, উপগলগ্রন্থি, অগ্নাশয়গ্রন্থি ও যৌনগ্রন্থিগুলির অন্তঃক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি এই গ্রন্থির সাহায্যে হয়ে থাকে।

এই গ্রন্থির তিনটি বিশিষ্ট অংশের মধ্যে সম্মুখ ভাগের অন্তঃক্ষরণ শিশুকালে বেশি হলে অতিকায়ত্ব, (gigantism) এবং পরিণত বয়সে বেশি হলে গরিলার মত মুখ, চিবুক, হাত পা (acromegaly) প্রভৃতি হয়; আবার তেমনি এ কম হলে শিশুকালে বামনত্ব (dwarfism) এবং অধিক বয়সে সায়মণ্ড রোগ (simond disease) নামক অতি শীর্ণকায়ত্ব ঘটে।

পশ্চাৎ অংশের অক্ষমতার জন্য তরল মূত্রাধিক্য বা ডায়াবিটিস ইনসিপিডস (diabetes insipidus) নামক রোগ জন্মে, তাতে মূত্রে গ্লুকোজ থাকে না, এবং ক্লোরাইডের পরিমাণও খুব কম থাকে। এই অংশের অন্তঃক্ষরণের পিটুইট্রিন (pituitrin) নামক যে উপাদান থাকে তাতে দেহের সর্বত্র ধমনী-সংকোচন এবং সন্তানপ্রসবকালে জরায়ুর সংকোচনও হয়।

একই সঙ্গে পুরোভাগের এবং পশ্চাৎভাগের অক্ষমতার জন্য অল্প বয়সে যে ফ্রলিক্'স্ রোগ (Forlick's syndrome) জন্মে, তাতে দেহের সম্যক্ বৃদ্ধি হয় না, নানা অংশে ঠিক মেয়েদের শরীরের মত চর্বি জমা হতে থাকে, যৌবনোচিত শারীরিক লক্ষণগুলি দেরিতে দেখা দেয়

মুখের ভাব অভিব্যক্তিহীন ও অনেকটা হাবার মত হয়, এবং মুখে সর্বদাই নিদ্রালস ভাব দেখা যায়।

কটিগ্রন্থি (suprarenal or adrenal glands)—দুটি বৃক্কের উপরকার চর্বির উপর অবস্থানের জন্য এদের অধিবৃক্ক অথবা কটিগ্রন্থি বলা হয়। উৎপত্তি ও ক্রিয়া উভয়রূপেই গ্রন্থির সম্পূর্ণ পৃথক দুটি অংশ বহিরংশ ও কেন্দ্রাংশে বিভক্ত। বহিরংশের অন্তক্ষরণের দ্বারা একদিকে পেশীর স্বাভাবিক কুঞ্চন ও শক্তি যেমন রক্ষিত হয়, আবার তেমনি দেহের জলীয় অংশ ও ধাতব উপাদানগুলির পরিমাণও নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং এর অভাবে অন্ত্র হতে স্নেহের পরিশোষণ কম হয় ব'লে রক্তে এর এবং কলেস্টরোলের পরিমাণও কমে যায়। গ্রন্থির এই অংশের অক্ষমতার জন্য মর্ফিন, হিস্টামাইন, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি বিষের ক্রিয়া অতি সহজে হয় এবং পরিপাকশক্তির হ্রাস হয়। আবার শিশুকালে এর ক্রিয়া অধিক হতে থাকলে, পুং-শিশুর অতিকায়ত্ব এবং স্ত্রী-শিশুর দেহে পূর্ণ নারীত্বের কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় এবং সময় সময় প্রাপ্ত-বয়স্কা রমণী দৈহিক পুরুষোচিত লক্ষণ (যেমন গোঁফ-দাড়ি প্রভৃতি) যুক্ত পুরুষালি মেয়েতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

কেন্দ্রাংশের বিশিষ্ট অন্তঃক্ষরণের 'যুদ্ধ, ত্রাস ও পলায়ন' সম্বন্ধীয় অন্তঃক্ষরণ বলা হয়। দেহের সর্বত্র সমব্যথী স্নায়ুতন্তুকে উত্তেজিত করে ব'লে এর দ্বারা হৃৎপেশীর অতিরিক্ত স্পন্দন, চক্ষুতারকার বিস্ফারণ, ধমনীর সংকোচন, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, ক্লোমশাখার শৈথিল্য প্রভৃতি ঘটে এবং যকৃতে গ্লাইকোজেন হতে অধিক পরিমাণে গ্লুকোজের উৎপত্তি হয়।

উভয় অংশের অক্ষমতার ফলে অ্যাডিসন'স রোগ (Addison's disease) জন্মে। এতে দেহের সর্বত্র এক প্রকার কালচে দাগ পড়ে,

রক্তের চাপ অতীব হ্রাস হয়, দেহের কর্মশক্তি কমে যায় ও পেশীগুলি অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়ে।

অগ্ন্যাশয়ের দ্বৈপিক অংশ (Cell-islets of pancreas)— সাধারণত প্রণালীহীন গ্রন্থিগুলিতেই অন্তঃক্ষরণ দেখা গেলেও অগ্ন্যাশয়কে এর ব্যতিক্রম বলা চলে, কারণ এর দ্বৈপিক অংশে ইনস্থলিন নামক যে উপাদানটি ক্ষরিত হয়, দেহের স্বাভাবিক শর্করা-বিপাক প্রক্রিয়ার জন্য তা অত্যাবশ্যক। এই উপাদানের দ্বারা যকৃত ও পেশীতে স্বাভাবিকভাবে গ্লাইকোজেনের সঞ্চয় এবং কর্মশক্তির জন্য যথোপযুক্ত গ্লুকোজের দহন হয় এবং ফলে চর্বিরও উপযুক্ত দহন হয় ব'লে রক্তাম্লতা ঘটতে পারে না। শর্করা ব্যতীত প্রোটিন প্রভৃতি অন্য উপাদান হতে গ্লুকোজের উৎপত্তিও এর দ্বারা বন্ধ হয়। স্থতরাং দেহে এর ক্ষরণ কম হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি, মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজের বহিষ্কার, অতিতৃষ্ণা, অতিক্ষুধা, বমনেচ্ছা, পেশীদৌর্বল্য প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত বহুমূত্র অথবা মধুমেহ রোগ জন্মে।

স্ত্রী ও পুং-গ্রন্থি (Gonads)—এই গ্রন্থির প্রজনন সম্বন্ধীয় ক্রিয়া ব্যতীত নিজ নিজ অন্তঃক্ষরণের জন্যও স্বতন্ত্র ক্রিয়া লক্ষিত হয়। শৈশবে পুং-গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের অক্ষমতার জন্য খর্বাকৃতি ও মেয়েদের মত মেদবহুল হয়, যৌবনলক্ষণগুলি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয় না, দেহ বিরল-কেশ এবং গলার স্বর মেয়েদের মত মিহি হয়ে থাকে। পরিণত বয়সে এরূপ অক্ষমতার জন্য কামেচ্ছা ও প্রজননশক্তি হ্রাস হয় এবং দৈহিক ও মানসিক দৌর্বল্যও দেখা যায়।

স্ত্রী-গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণজনিত ক্রিয়াগুলি নিম্নে উল্লেখ করা গেল :—

(১) প্রতিমাসে গর্ভাধারণক্ষম কালে, এর সাহায্যে এক বা ততোধিক স্ত্রীবীজ নিষ্কাশিত হয় ; গর্ভসঞ্চারে ঋতু বন্ধ হয়ে যায় এবং ভ্রূণ জরায়ুর

মধ্যে নিজস্থান গ্রহণ ক'রে গর্ভফুলের দ্বারা নিজ পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে ও স্তনের আনুষঙ্গিক পরিবর্তনগুলিও ঘটে থাকে। যৌবনোদ্গমকালে এর প্রভাবে যোনি ও জরায়ুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় ও রজোদর্শন ঘটে এবং বিকশিত নারীদেহের অন্যান্য লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়। এইভাবে স্ত্রী-গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের প্রভাবে যোনি ও তৎসহযোগী অঙ্গগুলির স্বাভাবিক পরিপুষ্টি ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ার ফলে শৈশবে অতি শীঘ্র দাঁত ওঠে, এবং অতি অল্প বয়সে নারীত্বের বিকাশ ও কামভাবের উদ্রেক হয়, এবং যৌবনপ্রাপ্তির পর এই কারণে অতিরিক্ত কামেচ্ছা, সাধারণ দৌর্বল্য ও বন্ধ্যাত্ব জন্মে। আবার এর অন্তঃক্ষরণের অক্ষমতায় দেহ শৈশবেই দীর্ঘ ও মেদবহুল হয়, দেহের পূর্ণতা ঘটে না, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য নারীত্বের লক্ষণগুলি দেরিতে দেখা দেয়, এবং পরিণত বয়সে, অনিয়মিত অথবা স্বল্প ঋতুস্রাব হয় ও বন্ধ্যাত্বও দেখা যায়।

১২

গর্ভসঞ্চার ও স্তনদুগ্ধ

দেহরক্ষা এবং বংশবৃদ্ধির প্রয়াস অভিব্যক্তির সকলের নিম্নস্তর হতে সর্বোচ্চ স্তর মানুষ পর্যন্ত সকল প্রাণীতেই দেখা যায়। সুতরাং জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক না হলেও সন্তানসন্ততির মাঝে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রজননতন্ত্রও শরীরবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে স্ত্রীগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের প্রভাবে যৌবনাবস্থাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের যতদিন পর্যন্ত সন্তানসম্ভাবনা থাকে,

সাধারণত প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে ঋতুস্রাব হতে থাকে। গর্ভাবস্থায়, স্তনদানকালে এবং কখনো বা সাময়িক অসুস্থতাবশতও ঋতু বন্ধ থাকতে পারে। প্রতি ঋতুকালে তিন হতে পাঁচ দিনে চার হতে সাত আউন্স পর্যন্ত রক্তস্রাব হয়, এবং ঋতুচক্রের সাধারণত তেরো হতে উনিশ দিনের মধ্যে স্ত্রী-গ্রন্থি হতে বীজ বের হয়ে আসে এবং জরায়ুসংলগ্ন বীজবাহী নলের দ্বারা জরায়ুর দিকে আসতে থাকে। ঐ কালে যদি জরায়ুমুখে শুক্রকীট প্রবেশ করে, তবে অসংখ্য কীটের একটি জরায়ু পার হয়ে বীজবাহী নলের মধ্যস্থ স্ত্রীবীজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে। অতঃপর নিষিক্ত বীজটি জরায়ুর মধ্যে চলে আসে এবং নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঐ স্থানে ক্রমবর্ধিত গর্ভফুলের দ্বারা ভ্রূণস্থ মাতৃদেহ হতে রক্তস্রোতে পরিপুষ্টি লাভ ক'রে ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। ভ্রূণের শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া এবং রেচনক্রিয়া মাতৃদেহের সাহায্যে হলেও এর হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, বৃক্ক প্রভৃতি প্রধান দেহযন্ত্রগুলির ক্রিয়া ভ্রূণাবস্থায় ক্রমশ স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে থাকে।

গর্ভসঞ্চারের পর প্রায় ২৮০ দিবসে অধোমস্তিষ্কগ্রন্থির পশ্চাৎ অংশের পিটোসিন নামক উপাদানের প্রভাবে প্রসববেদনা আরম্ভ হয়; তারপর গর্ভফুলের পরিণতাবস্থায় ঈস্ট্রোজেন (oestrogen) নামক উত্তেজক উপাদানের স্ত্রী-গ্রন্থির বর্ণোপাদনের (corpus luteum) ক্ষয়বিকৃতি ও আনুষঙ্গিক জরায়ুর পেশীর সংকোচন ও তার মুখের বিকোচন হেতু সন্তান প্রসূত হয়, এবং তৎপরে গর্ভফুলেরও বহিষ্কার ঘটে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশু যখন ফুসফুসের দ্বারা প্রথম প্রশ্বাস নেয়, ত'ারই জন্য জন্মিবামাত্র তার কান্না শোনা যায়।

গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতি জননীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করে, শিশুর অতিপ্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করে রাখে। তৎপূর্বে যৌবন

বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীগ্রন্থির উত্তেজক উপাদানের সাহায্যে তার বৃদ্ধি হয়, এবং গর্ভসঞ্চারের প্রথম অবস্থায় আকারে আরও একটু বড় হলেও দুধ আসে না, কিন্তু শেষ অবস্থায় যখন দুধের ক্ষরণ হতে থাকে, তখন স্তনগুলি আরও বড় হয় এবং বোঁটা দুটিও শক্ত ভাবে উঁচু হয়ে ওঠে। স্ত্রীগ্রন্থির এবং সম্ভবত গর্ভফুলের ঈস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরোন (progesterone) নামক উত্তেজক উপাদান দুটিই এরূপ স্তনের আকার বৃদ্ধির এবং পরিশেষে দুগ্ধ ক্ষরণের জন্য দায়ী। সন্তানপ্রসবের পর প্রথম তিন চার দিন স্তন হতে একপ্রকার ঘন চটচটে সাদা তরল পদার্থ ক্ষরিত হয়, তাকে কলোস্ট্রম (colostrum) বলে; শিশুর খাদ্য হিসাবে এ সম্পূর্ণ অযোগ্য ব'লে এ কটা দিন শিশুকে স্তনদুগ্ধ না দেওয়াই উচিত। অতঃপর যে সময় থেকে শিশু নিজে মাতৃস্তন হতে দুধ টেনে নিতে আরম্ভ করে, অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থির দুধের ক্ষরণোত্তেজক উপাদানের (prolactin) সক্রিয়তা বৃদ্ধি হয় ব'লে স্তনেও অধিকতর দুধ প্রস্তুত হতে থাকে; এতে জননীরও উপকার হয়, কেননা, স্তনদানের জন্য গর্ভাশয়ের স্বভাবকুঞ্চন বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ তা আকারে ছোট হয়ে নিজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। এইজন্য শিশুকে নিয়মিতভাবে স্তনদান প্রসূতি ও সন্তান উভয়ের পক্ষেই উপকারী।

মানবশিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত খাদ্য। কোনও কারণে এর অভাব হলে গরুর অথবা ছাগলের দুধ, মাতৃস্তনের অনুরূপ করে দেওয়া চলে। সমপরিমাণে জলমিশ্রিত করলে এই সকল দুধের প্রোটিন ও লবণ জাতীয় উপাদান মার দুধের মত হয়, কিন্তু স্নেহপদার্থ কতকটা এবং শর্করা অনেকটা ক'মে যায় ব'লে তাতে অল্প ক্রীম এবং বেশ খানিকটা চিনি মিশিয়ে নিলে তবে মাতৃস্তনের অনুরূপ হয়

এবং তা হতে শিশু মার দুধের মতই পুষ্টি লাভ করতে পারে। খাদ্যরূপে দুধের উপাদানগুলির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

১৩

দেহের ক্ষয় ও মৃত্যু

শিশুকাল হতে যৌবনাবস্থা পর্যন্ত দেহের প্রত্যহ যে ক্ষয় হয় তা কি ভাবে খাদ্যের দ্বারা ও অন্তর্নিস্রাবী গ্রন্থিসমূহের প্রভাবে পরিপূরণ হয়ে দেহ বৃদ্ধি হয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। যৌবনকাল হতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্যন্ত দেহের সংগঠন-বিগঠন-প্রক্রিয়া পরিমাণে প্রায় একই রূপ হয় ব'লে দেহের বৃদ্ধি আর হয় না এবং ক্ষয়ও কম হতে থাকে, কিন্তু পরবর্তী কালে বিগঠনক্রিয়া ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করতে থাকে ব'লে দেহে জরার আবির্ভাব হয় এবং জীবনীশক্তি হ্রাসের ফলে অত্যাবশ্যক অংশগুলির সক্রিয়তাও কমতে থাকে। কারো কারো মতে অন্ত্রগুলিতে নানাবিধ জীবাণুর ক্রিয়াই এর জন্য দায়ী। এরূপ জরাজীর্ণ দেহ যখন ভারস্বরূপ মনে হতে থাকে, তখন পরিণত বয়সে জীবনের অতি স্বাভাবিক পরিণাম মৃত্যু এসে মহানিদ্রার কোলে চিরশান্তির ব্যবস্থা করে। কবি তাই যথার্থ ই বলেছেন—

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা